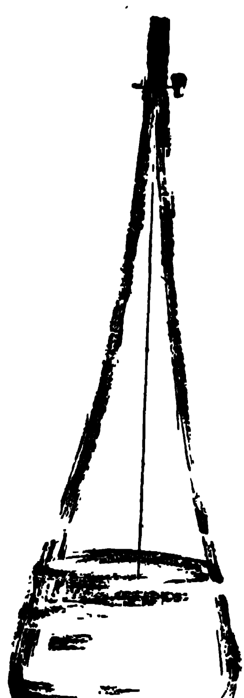
একটি সংগীতের জন্ম-কাহিনী

অমরেন্দ্র ঘোষ

একটি সংগীতের জন্ম-কাহিনী

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড



৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯
অফিস: ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ
আগস্ট ১৯৬২

প্রচ্ছদ
বিভূতি সেনগুপ্ত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খান লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

একটি সংগীতের জন্ম-কাহিনী

অমরেন্দ্র ঘোষের আরও কিছু বই

উপন্যাস

দক্ষিণের বিল (তিন খণ্ড)
চরকাশেম
পদ্মদীঘির বেদেনী
ভাঙ্গছে শুধু ভাঙ্গছে
বেআইনী জনতা
কনকপুরের কবি
জোটের মহল
মন্থন
ঠিকানা বদল
রোদনভরা এ বসন্ত
অহল্যা কন্যা
নাগিনী মুদ্রা
মন দেয়া নেয়া
কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু

উপন্যাস

একটি স্মরণীয় রাত্রি
মৃগসৌরভ
জবানবন্দী
জি হুজৌর

গল্পসংগ্রহ

অমরেন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত গল্প
কুসুমের স্মৃতি
স্বনির্বাচিত গল্প
অনাস্বাদিত চুম্বন
অথচ সিঁড়িটা একদিন এমন ছিল না
এ পাড় ও পাড়
ধূসর রাগিনী
সমুদ্রপোত

নাটক

এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জ
ফসল *(গীতিনাট্য)*

এক

এমন জ্যোৎস্না, দেখলে দিন বলে ভ্রম হয়। খালের এই বাঁকটা অত্যন্ত পত্রবহুল। ঘন ফলকর গাছগাছালি ত্বপারে। তবু সেই পাতা ও ডালের ফাঁক দিয়ে মধুর মত মাদক জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে। নিচে খালের জল, ওপরে অনন্ত আকাশ, মাঝখানে মাটির পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে প্লাবনে।

খালের জলে তিনখানা এক বৈঠার ডিঙি বাঁধা এক কাতারে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নৌকা তিনখানার ওপর এসেও যেটুকু জ্যোৎস্না পড়েছে তাতে সবই ঠাহর করা যায়। ছই ছাপ্পর পাটাতন, হুঁকো কল্কি হাসুয়া একখানা। আরও দেখা যায় কিরীট, কুণ্ডল, সাতনরী। একখানা ফুলধনুও গড়াগড়ি যাচ্ছে এক নায়ের গলুইতে। ছেঁড়া মালাও রয়েছে গোটা তিনেক পড়ে।

এ সব নাও সাধারণত নিম্ন বাংলার গাঙে খালে দেখা যায়—কেরায়ার মাঝিরাই ব্যবহার করে। কিন্তু সে নৌকার পাটাতনে সাত আটখানা নানা রঙের, নানা দামের শাড়ি এলো কোত্থেকে? রেশমী, সাদা খোলের মিলের শাড়ি—হাওয়া লাগলেই উড়ছে তাঁতের পাঁচরঙা জামদানী।

কেরায়ার নৌকায় কি মাঝিরা চলেছে তাদের স্ত্রীলোক নিয়ে?

তাদের ফুলধনু কিরীট কুণ্ডলে কি প্রয়োজন?

প্রশ্নটা জটিলই বটে!

এ ডিঙি তিনখানা বৃন্দার সখের ঢপের দলের। দলটা সখের, কিন্তু বিনা আগামে একটি রাতও গাইতে চায় না বৃন্দা। তবে এদেশের লোকও সহজ নয়—আগাম প্রায়ই কেউ দেয় না। কেবল শ্রাদ্ধবাড়ি দায় ঠেকা, বৃন্দা নইলে রামায়ণ কে গাইবে, মৃতের আত্মার

শেষ-গতিই বা কি করে হবে ঐ মধুর নাম ছাড়া—তাই কিছু অগ্রিম দিয়ে তাকে আনতে হয়। নইলে আর পাঁচ জায়গায় গেয়ে যা পায় তা এমন একটা হিসেবের কিছু নয়। শুধু পায় মুখের মধু আর খোরাকী।

পরিশ্রম করে উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে পেয়েই দলটা সখের হয়ে গেছে।

তাই সুখ নেই বৃন্দার মনে।

কিন্তু ঐ দলের একটি লোক নির্বিকার। সে গান ধরেছিল একখানা নৌকার গলুইতে বসে।

পরাণ বন্দুরে তোমার তরে

ঝরে আমার চৌক্ষের পানি···

খালপার থেকে একটা হাসির রোল ভেসে এলো নৌকা পর্যন্ত। পাঁচ সাতটি মেয়ের হাসি বিদ্যুৎ শলার মত এসে ঠেকল গদাইর কানে। অমনি গানটা থেমে গেল। অসমাপ্ত কলি আর সমাপ্ত হলো না। যেন সদ্য জ্বালা প্রদীপ একটা দমকা হাওয়ায় নিভে গেল।

যারা হাসছিল তাদের মধ্যে সব চেয়ে তীক্ষ্ণধার সৌদামিনীর হাসির। বৃন্দা, মালতী, অন্নদা, শ্যামলাও হাসছিল কিন্তু অত শানিত নয় তাদের হাসি। সৌদামিনীর হাসিতে শুধু তীক্ষ্ণতাই নেই, আছে কুটিল বিদ্রূপের বিষ। এক কণিকায়ই কাবু করে দিতে পারে একটা জোয়ান বলিষ্ঠ মানুষকে।

খালপারের ছোট ছোট শঠিবন চিরে ওরা এগিয়ে আসতে লাগল। সৌদামিনী ঢলে ঢলে পড়ছিল অন্নদার গায়। 'শুনলি, গদাই গান গাইছে—ওলো তোদের গদাই লো—গাধাই।'

'একেবারে যে গলে গলে পড়ছিস। গাধার গান শুনেই এই, মানুষের গান শুনলে না জানি তোর হতো কি! একটু ভাল করে সমঝে চল। এটা প্রেম-কুঞ্জ নয়, শঠিবন।' সৌদামিনীকে একটা ঠেলা দিল অন্নদা। পড়তো পড়, পড়ল গিয়ে একটা বেতের লতায় সৌদামিনী জড়িয়ে। কচকচে কাঁটায় জড়িয়ে ধরল তার চুল

জেলের বঁড়শির মত। হাতে পায়ও বিঁধল ছুটো একটা। 'ভাই অন্নদা একটু··'

'ধরব তোমায় ? তা গদাই ছাড়বে কেন ? ধরেছে শক্ত করে। আর ঠাট্টা করবে বোকাকে ?'

হিঃ হিঃ হিঃ। 'গাল তুখানা সাবধান সৌদামিনীদি।' মালতী আবার হাসল—হিঃ হিঃ হিঃ।

বিপদের গুরুত্বটা বুঝেও এবার দলের বাকি সকলে খিলখিল করে উঠল।

পরিষ্কার ফুটফুটে জ্যোৎস্না, কিন্তু পথের এ জায়গায় একটা পুরান বাঁশঝাড়কে জড়িয়ে জন্মেছে একটা সতেজ বেতের লতা। প্রচুর ছায়া ও সরস মৃত্তিকার আশীর্বাদে এর প্র'তি অঙ্গে আঁকড়ার দীঘলি অলংকার লকলক করছে। দিনের বেলায় কাঁটাগুলো দেখলে ভয় হয়। রাত্রের অন্ধকারে আচমকা জড়িয়ে গেল সৌদামিনী। সে একটা আঁকড়া এড়াতে গিয়ে দশটা আঁকড়ার ঘা খায়। ক্রমে তার আষ্টেপৃষ্ঠে সারা দেহে লাগল আঁচড়। সে যন্ত্রণায় যত ছটফট করে, ওরা ততই হাসে। ঠিক পরিষ্কার সব দেখা তো যাচ্ছে না। অবশেষে গদাইর ডাক পড়ে।

গদাই একটা আলো জ্বেলে ওপরে ওঠে।

'এতক্ষণে খেয়াল হলো বুঝি ? লোকে সাধে বলে গাধা !'

'আমি তো বুঝতে পারিনি রাধাদিদি।'

অন্যান্য সকলে খালপারের দিকে এগিয়ে গেছে। গদাই অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে নড়তে নিষেধ করল। সে আলোটা রেখে ছুটে নৌকায় গেল হাসুয়াটা আনতে। ফিরে এল চট করে। সে ধীরে ধীরে শাণিত হাসুয়া দিয়ে বেতের আঁকড়াগুলো কাটতে লাগল। কাটতে কাটতে সে মাঝে মাঝে ছন্দছাড়া হয়ে যাচ্ছিল যেন। সৌদামিনী সুন্দরী বটে—নাম আছে তার সাত গাঁয়ের দলে, কিন্তু এত রূপও তার ! তাই বুঝি সে নিত্য রাধিকা সাজে। প্রণয়, সোহাগ, আকিঞ্চন জানায় দলের ভাগ্যবান গোলক কৃষ্ণকে।

গদাই নিতান্ত কুৎসিৎ। যেমন তার মুখখানা এবড়ো-থেবড়ো—তেমনি তার নাকটা মোটা, চোখ দুটো মিটমিটে। আর চুলগুলো তো শূয়রের কুচি।

গদাই জানে সৌদামিনীর তুলনায় সে কত নগণ্য। সে তাই রাধাদিদির মুখের দিকে বড় একটা চোখ তুলে তাকায় না। কিন্তু আজ দায় ঠেকে দেখতে হলো তার অপাংগে চেয়ে। তাই কোন সময় যেন হাসুয়া অর্দ্ধ পথেই থেমে গেল—চোখ জোড়া তার চেয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। একি মানুষের ঘরের মেয়ে? এ যে সত্যি সত্যিই শ্রীরাধা।

একটা ঈর্ষা হয় গোলকের ওপর,—সঙ্গে সঙ্গে হয় ভ্রান্তি।

'ওকি শাড়ি ছাড়, শাড়ি ছাড় গদাই।'

'না গো আমি তোমায় বেসামাল করব নি—আমার কাণ্ড জ্ঞেয়ান আছে।'

ক্ষিপ্র হাতে গদাই উরু ও নিতম্বের কাঁটাগুলো কেটে দেয়। ভ্রূ কুঁচকে মাটির দিকে চেয়ে যতটা সংযত হয়ে কাজ করা যায় তাই ও করে।

সৌদামিনী ঠিক লজ্জিত হয় না। তবু মাঝে মাঝে তার শরীর ছমছম করে ওঠে। পুরুষের পৌরুষ যখন সদম্ভে হাসুয়া হাঁকিয়ে চলছে তখন ও শুধু একটি বিপন্না নারী। কোথায় তার অহংকার, কোথায় তার ঠমক? এখন গমক দেখালেও ও মরবে।

'একটুকুন তেল মেজো নায়ে গিয়ে—আমি হাড়-মুড়মুড়ি পাতা এনে রস করে দেবখন। আহা দেখি দেখি কোথায় কোথায় ছড়ে গেছে?'

'ভাগ গাধাই।' বলে বুকে রেশমী উড়নী জড়িয়ে আলোটা তুলে নিয়ে সদ্যমুক্ত সৌদামিনী ছুটে যায়।

চাঁদের আলো যতই স্পষ্ট হক না কেন তাতে লতা পাতা চেনা কঠিন। তবু গদাই সৌদামিনীর জন্য খুঁজতে লাগল ওষধিপাতা! সব জায়গায় কি সব কিছু মেলে? অমিল হলেও মিলাতে হবে। এ তার গ্রাম হলে বারুই বাড়ির বরজের কাছে থেকে সে অনায়াসে সংগ্রহ করে আনতে পারত। এ যে অচেনা অজানা স্থান।

একটা ঝোপের কাছে এসে শিশিরে ভিজা সারালো বিছুটি লতায় হাত দিয়ে বসল গদাই। আর যায় কই! একেবারে সর্ব শরীর জ্বলে উঠল—ফুলে উঠল দাগড়া দাগড়া হয়ে ডান হাতখানা। গদাই অসহ্য যন্ত্রণা চেপে তবু খুঁজে খুঁজে বের করল ওষুধ।

সে নায়ে গিয়ে বেটে রস করে দিল সৌদামিনীকে।

সৌদামিনী সুস্থ হলো, কিন্তু জ্বলতে লাগল গদাই। আজকের জ্বালা তার শুধু বিছুটির জ্বালা নয়। দাউ দাউ করে উঠল অন্তর আক্রোশে। কার ওপর তার এ আক্রোশ, তা সে হয়ত বলতে পারে না। কিন্তু বুঝতেও তো পারে না কিছু।

বৃন্দা ডাকল, 'গদাই'

'যাই যাই—আমার বুঝি মরার ফুরসতও নেই।'

'কি হয়েছে?'

'জাংগালে বিছুটি ছুঁয়েছি।'

মাঝখানের নৌকা থেকে মুখ বের করে হাসল মালতী। শ্যামলাও একটু না হেসে পারল না কিন্তু শব্দ হলো না তার হাসির। অন্নদাও একটু মুখ মচকাল।

'কেন গিয়েছিলি মরতে?'

'সকলের জন্যিই তো আমাকে মরতে হয়। এ নায়ে যিনি পা দেন তাঁরই গোদ হয়—নইলে জাংগালে বিছুটি লাগে আমার গায়।'

দলের মধ্যে সেরা নাও এইখানা। দলে নায়ক নায়িকা কিম্বা গায়ক অথবা বাজিয়ের অভাব হলে মাঝে মাঝে দু একজনকে দূর থেকে যত্ন করে আনতে হয়। এখন ফুরন খাটছিল সৌদামিনী। এমনি স্ত্রীলোকই আসে বেশি। তাদের পায়ের আলতা থেকে চুলের ফিতাটি পর্যন্ত এগিয়ে জুগিয়ে দেওয়ার ভার এই গদাইর ওপর। গদাই হচ্ছে এ নায়ের মাঝি।

অতএব গদাই যেমন গাধা নয়—সৌদামিনীও তেমনই এ দলের মেয়ে নয়।

দুই

তবু পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় একটা যোগ ছিল। ওরা এক গাঁয়ের একই পাড়ার বাসিন্দা। শুধু তফাত এবাড়ি ওবাড়ি—মাঝখানে মাত্র একটা কনুই ভাঙা সোঁতা খাল। ছোট ছেলে মেয়েরাও ডিঙিয়ে আসতে পারে যখন-তখন। ওরা জাতিতে নমশূদ্র। কিন্তু গদাইর বাবা ছিল একজন গ্রাম্য কৃষাণ, আর সৌদামিনীর মামা মহাজন।

কিছু মাটি কেটে সোঁতা খালটা বুঁজিয়ে দিতে পারত সৌদামিনীর মামা। শুধু আভিজাত্যের ভয়ে সে তা করেনি। গদাইর বাপের ভাঙা চাল দেখে কেউ না আবার সন্দেহ করে ওরাও মাতব্বর বাড়ির এক ঘর। মাতব্বর বাড়ির সব ঘরগুলোই ঝকঝকে টিনের। দেখলে মনে হয় যেন টাকার গাঙে মস্ত মস্ত তুফান উঠেছে।

তবে সৌদামিনীর মামা লোকটা ছিল অত্যন্ত ভাল। সর্বদাই গদাইদের খোঁজ খবর নিত। ধান কাটার সময় জন খাটার নিমন্ত্রণটা ওরাই আগে পেত। ওদের ছিল বুদ্ধির অভাব, সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও—তাই কম মজুরিতেই ওরা রাজি হতো। ওদের বাপ বেটাকে নজির খাড়া করে আর পাঁচজনকে কম মজুরি দিতে পারত মাতব্বরেরা। এমনি ওদের শ্রমের প্রচুর শস্য শুষে রাখত আয়ামে। সেই শস্যেরই কিছুটা অংশ আবার ওদের ধার দিত বর্ষাকালে। তাই গাঁয়ের পাঁচজনে ওদের ভাগ্যকে হিংসা করত—অর্থাৎ ওদের মত যারা ভূমিহীন কৃষাণ। বাকি পাঁচজনে ব্যাখ্যা করত সৌদামিনীর মামাকে।

সত্যই সৌদামিনীর মামা লোক ভাল ছিল!

সৌদামিনীই বা মেয়ে খারাপ হবে কেন? বড় ঘরের আদুরে ভাগনী! তাতে আবার মা-বাপ মরা। সৌদামিনীর মামীরও কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। সে বসে বসে দুধের সর দিয়ে ওর মুখ মেজেছে। দেশী তাঁতীরা যত রকম রঙিন শাড়ি বুনতে জানে, তার বোধহয় একখানাও বাকি নেই ওর পরতে। বড় হাতার নেভি ব্লু লেস-ওয়ালা জ্যাকেটও আসত তার জন্য। ছিটের নয়, ভেলভেটের। একটুখানি সৌদামিনীকে দেখাত দামিনীর মত। মামী আদর করে তাকে ডাকত রাধা বলে। রাধার জন্য যখন একজন পণ্ডিত রাখা হলো মাতব্বর বাড়িতে তখন বিশিষ্ট বামুনেরাও ছুটে এলো। উচিত হাতে খড়ির একটা আয়োজন করা,—তার সূক্ষ্মার্থ, প্রয়োজন ব্রাহ্মণ ভোজনের। কারণ এই নাকি প্রথম মা সরস্বতী প্রবেশ করছেন মাতব্বর বাড়ির মেয়ে মহলে। ধান ছিল প্রচুর। একটা বিরাট হৈ চৈ হয়ে গেল অনায়াসে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আশীর্বাদটাও কাজে লাগল। এমন ফল অবশ্য সব জায়গায় ফলে না।

কিছু দিনের মধ্যেই সৌদামিনী লেখাপড়া শিখে প্রস্তুত হতে লাগল কুলে কালি দেওয়ার জন্য। যাবে নাকি এক নাপিতের ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে। সে গান গায়, পাঠ বলে এক যাত্রার দলে। ভাবে সে যখন ভরপুর তখন কিশোরী রাধার চোখে জল টলটল করে। এর আগে রাধা ওর গান ও পাঠ শুনেছে পাঁচ রাত্রি। ও যে দলে থাকে সেই গানের দলটা এবার নাকি চৈত্র সংক্রান্তিতে এসেছিল মাতব্বর বাড়ির মেলায়। মেলাটা মেলে একেবারে ও বাড়ির খাল পারে—লিচু এবং নিমগাছগুলোর তলায়।

আরও একটা বছর ঘুরল। তারপর আরও একটা।

মাল্‌সি এবং সুন্দর সুন্দর ভাসাদ গান মুখস্থ করল রাধা। মামীর বাবা নাকি এক সিদ্ধ পুরুষ ছিল। নানা দেশ ঘুরে এলো মেয়ের কাছে। সে যত্ন করে মাল্‌সি গান (রামপ্রসাদী গান) শেখাল রাধাকে। অর্থাৎ সুর ছন্দ তান লয় সহযোগে। মামীর আপসোস মিটাল তার বাবা। এখন হয়ে উঠল রাধা সর্বগুণে গুণবতী।

কালী গো কেন ল্যাংটা ফের
বসন ভূষণ নাই তোমারও
রাজার মেয়ে গরব কর।
আপনি ল্যাংটা পতি ল্যাংটা মা
পতির বুকে চরণ ধর।
আমরা সবে মরি লাজে
এবার শ্যামা বসন পর।।

এ গান গাইতে গাইতে রাধার মন উদাস হয়ে যেত। সময় সময় বৈরাগ্য জন্মাত রামপ্রসাদী গানে। অল্প বয়স থেকেই রাধা ভাবপ্রবণা হয়ে উঠল। যেন বন্যা এলো তার মনের মানস সরোবরে। এখনই পাড় ছাপিয়ে পড়বে, চায় একটা গতি, চায় একটা মুক্তি। পথ কই?

এমনি সময় এলো আবার বৃন্দার দল।

বিশ বছরের বৃন্দার মুখে তখন ঝিকিমিকি হাসি। মিষ্টি না বিষ, বোঝা দায়। সে চায় তার দলটাকে এদেশের সর্বপ্রধান দলে পরিণত করতে। তার বৃদ্ধ পিতা যা ত্রিশ বছর ধরে চেষ্টা করে পারেনি, তাই সে তিন বছরে করবে। গড়বে একটা অহংকারের অট্টালিকা।

'তোমার নামটি কি?' বৃন্দা জিজ্ঞাসা করল।

'সৌদামিনী—মামী ডাকে রাধা বলে।'

'কেমন লাগছে গান শুনতে?'

সসংকোচে রাধা জবাব দিল, 'ভাল।'

'ভয় কি, কাছে বসো।' চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা তুলে দেখল বৃন্দা।

পরদিন একেবারে মাতব্বর বাড়ির উঠানে হবে গান। বাড়ির মেয়েরা ঘরে বসে শুনবে। বৃন্দা ভোর বেলাই এসে দখল করে বসল সৌদামিনীদের ঘরের বারান্দা। দলের অন্যান্য মেয়েরা সব এ-ঘরে ও-ঘরে গেল আলাপ করতে, কেউ বা পান তামাক খেতে—পুরুষেরা ছুটল গাঁজা-ভাঙ-তাড়ির চেষ্টায়। কিন্তু বৃন্দা ঠায় বসে রইল।

এদিকে কদিন ধরে নৌকা-বিলাস মান-ভঞ্জনের গান শুনে শুনে সৌদামিনী যেন ভুলে গেল শ্যামা-সংগীত। সে যে কটা কলি মুখস্থ করেছে তাতে সুর তাল যোগ করলে কি হয় তাই পরখ করবার জন্য ব্যস্ত। সমঝদার কই? যার তার কাছে গাইতেও তো লজ্জা করে। হয়ত ঠাট্টা নয়ত ব্যঙ্গ করবে। ওর নামটি তো রাধা—এখন আধো-আধো ভাবে ও যদি শ্রীরাধার মত এক একটি কলি গেয়ে শোনাতে পারত গোলক কৃষ্ণকে। আর গোলক যদি অমনি ভাবে বিভোর হয়ে সাড়া দিত ওর গানে!

সৌদামিনী গাইত—

আমায় ফেলে কোথা যাও, যাও হে?···

গোলক নিকুঞ্জবনে এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে মিষ্টি সুরে জবাব দিত—

রাধে আমায় ভুল বুঝ না।
আমি তোমায় ছাড়তে নারি॥···

আবার বিপন্না অসহায়া বলে নিজেকে মনে হয় সৌদামিনীর। মনে হয় সে যেন সেজেছে চন্দ্রাবলী। গোলক তাকে ফাঁকি দিয়ে শ্রীরাধার কুঞ্জে চলে যেতে চায়। হায় হায় করে ওঠে তার বুক। শূন্য শয্যায় সে কেমন করে একা রাত কাটাবে? ঐ তো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এলো দামাল হাওয়া। মাতাল করছে বন। শব্দ হচ্ছে সনসন। আবার বিজলী—ডাকছে গুরু গম্ভীর স্বরে দেয়া। শিউরে উঠল কেয়া কাঁটার দল।

চন্দ্রাবলী জানিয়েছিল সেই যুগে—

তোমায় যেতে দেব না···

চতুর কৃষ্ণ জবাব দিল—

কাল আসিব···
কাল আসি হাম
পুরাইব কাম
এই বাসনা মনে।

চন্দ্রাবলী এগিয়ে এসে ক্ষুণ্ণ মনে গাইল—

আমি তো তোমার, তুমি যে রাধার

রাধার ও দুখের দুখী···

তখন চতুর কৃষ্ণ উত্তরে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলাতে চাইল—এবং ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে গাইতে গাইতে কুঞ্জদ্বারে এসে দাঁড়াল—

কে বলে রাধার, আমি যে তোমার

তুমি যে পরাণ-সখী···

অন্তরে পরাণ বাটিয়া দিব গো।

বাহিরে দেখাব আন।···

কৃষ্ণ চলে গেল—সৌদামিনী কেঁদে ফেলল। বাস্তবিকই কাঁদল অঝোরে—

তুমি ফাঁকি দিয়ে কোথায় গেলে গো···

পুকুর পারে খেজুর গাছ তলায় দাঁড়িয়ে গান গেয়ে কাঁদছিল সৌদামিনী। ভাবতে ভাবতে সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

গদাই এসে ধানের আঁটি মাথায় অবাক হয়ে দাঁড়াল। 'কি হয়েছে রাধাদিদি?' একে বড় হিস্‌সার ভাগনী, তাতে সুন্দরী, তাই গরবিনী সৌদামিনীকে দিদি বলে ডাকতে হতো কামলা মজুরের। গদাই আবার প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে গো রাধা বোনদি?

সত্যই তো, রাধা কাঁদবে কেন? রাধার কুঞ্জ তো উজ্জ্বল হলো বলে। ঐ তো আসছে কৃষ্ণ! ঐ তো বাজে নূপুর!

কখন যেন বৃন্দা পুকুর পারে এসে দাঁড়িয়েছিল—বলল, 'গাও তো তারপর।'

চোখের জল মুছে, একটু ফিক করে হেসে পালিয়ে গেল সৌদামিনী। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল যে সত্যিই সে একা বহু রূপে তন্ময় হয়ে গান গাইছিল।

বৃন্দা একটু দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে চলে গেল।

গদাইর এ সব যেন অপছন্দ ঠেকল। কিন্তু তার কথা তো শুনবে না কেউ। সে কাস্তে হাতে মাথায় ধানের আঁটি নিয়ে

উঠানের দিকে এগিয়ে গেল। ধানের বোঝা যথাস্থানে পালা দিয়ে সে ঢুকল বাড়ির ভিতর। ততক্ষণে সে দেখতে পেল যে বৃন্দাও এসেছে। খুব হাসি গল্প জমিয়ে নিয়েছে বাড়ির অন্দর মহলে। গদাই যে এসে দাঁড়াল তা কেউ লক্ষ্য করল না। সে কিছু যে বলবে এমন ফাঁক পেল না। সকলেই ব্যস্ত বৃন্দার সঙ্গে আলাপ করতে।

এমন যে বৃদ্ধ মামা সেও গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানছে আর কি যেন চেয়ে চেয়ে দেখছে। দলিল পর্চার দিকে যে দৃষ্টিতে সাধারণত এই বুড়ো মহাজনেরা তাকায় তার চেয়ে বহু গুণে রসাল যেন এ দৃষ্টি। মাঝে মাঝে বিলোল কটাক্ষ হানছে বৃন্দা। প্রত্যেক কথাটির রেশ যেন শেষ হচ্ছে বুড়োর বুকের ভিতর গিয়ে। একটা গানের গমক উঠেছে যেন বাড়িময়। সবাই পাগল—পাগল এ বাড়ি শুধু নয়, সারা গ্রামখানা। কে না এসেছে এখানে? কে না বসেছে পংক্তিতে—কেবল অপাংক্তেয় আমাদের গদাই। রাধা দিদির এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এসেছিল সে ছন্দ কেটে দিতে। কিন্তু তাকে কেউ আমল দিল না। বৃন্দা যেন যাদু করে এতগুলো মানুষকে সরিয়ে রাখল দূরে।

মূর্খ গদাইর রাগ হলো।

'তোমাদের বাড়ি কোথায় গো?' একটি বৌ প্রশ্ন করল।

'সপ্তগ্রাম।' বৃন্দা জবাব দিল, 'আসল বাড়ি নায়ে—যখন যে দেশে থাকি।'

'বিয়ে বসবে না?'

মামার দিকে চেয়ে জবাব দিল, 'কে আমাদের ঘরে নেবে? আমরা যে কৃষ্ণের নামে নিবেদিতা।'

'তোমরা কি জাত—বৈরাগী?'

'না দিদি, মহাভোগী। ভোগের অন্তেই শ্রীভগবান দেখা দেন।'

সজোরে আওয়াজ করে তামাক পোড়াতে লাগল মামা। গুড়ুক গুড়ুক···গুড়ুক গুড়ুক।···

'ক পুরুষ এ দল করেছ ?'

'দু পুরুষ—তবে আমি মেয়ে।' হাসল বৃন্দা।

আর একজনে প্রশ্ন করল, 'আজ তো শেষ হবে গান—আবার আসবে না ?'

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।' এবার যে ভাবে বৃন্দা চোখ ঘুরাল তাতে তামাক কেন দুনিয়া পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে।

শুধু গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হলো—স্ত্রীলোকের হাটে মহাজন তার ওজন দিল না।

যাওয়ার সময় বৃন্দা মামীকে ডেকে একান্তে যা বলে গেল তা শুধু গদাই শুনল। 'দলের ছেলেদের কাছে যেন মা, মেয়েরা যায় না। গেরস্থ ঘরের মেয়েদের অত গান বাজনার রোখ ভাল না।'

বৃন্দা শেষ হাসিটুকু শুধু হাসল গদাইর দিকে চেয়ে। গদাই হাঁ করে রইল বোকার মত।...

গদাই উঠে এল ওখান থেকে।

দু'বাড়ির মাঝখানের সোঁতাখালটা হঠাৎ কেন জানি গভীর হয়ে গেছে। লাফ দিয়ে গদাই এপার এসে আর টাল সামলাতে পারল না। খানিকটা পাড় ভেঙে পড়ে গেল একটা কেয়া ঝোপের কাঁটার ওপর। বলিষ্ঠ কাঁটা, গদাইকে ক্ষত বিক্ষত করে ছাড়ল।

এ দুখানা বাড়িতে ব্যবধান এবং বৈষম্য চিরদিনই ছিল। আজ যেন পাড় ভেঙে বাড়তে চলল দূরত্ব।

যত কথাই বৃন্দা বলুক—খালের স্রোত চলছে কুল-কুলিয়ে—গদাইর মন উঠছে কেবল ঘুল ঘুলিয়ে।

তিন

গদাইর শৈশবের সাথী এই সৌদামিনী। বিদ্যুতের মতই তাকে দূরে রেখে চলেছে ও। যখনই কাছাকাছি হয়েছে তখনই ও খানিকটা পুড়ে গেছে তবু সঙ্গ ছাড়েনি। কত রঙ্গ করেছে ওকে নিয়ে রাধা।

সেবার যখন ধানের পালাটার ওপর উঠেছে গদাই—মাথায় তার মস্ত একটা আঁটি—সৌদামিনী ছুটে এসে নিচ থেকে একটা আঁটি টেনে নিয়েছে। গদাই বোঝা সমেত একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুমুখে। ব্যথা পেয়েও গদাই মুখখানা বিকৃত করে হেসেছে। কুৎসিত মুখ যত দূর সম্ভব লজ্জারুণ হয়ে উঠেছে। ধুলো বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেছে, 'আমার কিচ্ছু হয়নি তো রাধাদিদি।'

'বোকার আবার হবে কি! সর, সর এখান থেকে।'

ও মনে বড় দুঃখ পেয়েছে।

কিন্তু একটু পরেই ওর দুঃখ দূর হয়েছে রাধার ডাকে। 'একটু সর ভাজা খাবি?'

লজ্জাহীন গদাই অমনি হাত পেতেছে। মহা অবজ্ঞায় প্রকাণ্ড এক দলা সরভাজা ওর হাতে দিয়ে বলেছে, 'যা বাটিটা মেজে বাড়ির ভিতর দিয়ে আয়।' সৌদামিনী চলে গেছে লেবু গাছের কলমগুলোর দিকে, প্রজাপতি দেখতে। কত রং আছে রেণুমাখা পাখনায়! ওড়ে কেমন ফড়-ফড়িয়ে! ওর বড় সখ হচ্ছে একটি জোড়া প্রজাপতি পুষতে।

'কেউ তো পোষে না এসব রাধাদিদি।'

লেবুবন মগ্ন হয়েছে নতুন কলির গন্ধে। প্রজাপতির মিছিল এসেছে যেন ফুলের লোভে। কত রং কত বাহার।

'কেন পোষে না গদাই?'

'পালবে কিসে ?'

'খাঁচায়।'

'পালিয়ে যাবে যে ফাঁক দিয়ে।'

'সত্যি কথা।' চিন্তিত এবং দুঃখিত হয়ে চুপ করে থাকে রাধা।

সৌদামিনীর দুঃখে গদাইরও দুঃখ হয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ প্রকাশ করেছে একরকম মুখ বিকৃত করে। তার মুখের রেখায় বা অঙ্কনে বিধাতা এমন কোন শ্রী দেয়নি যা অপূর্ব হয়ে উঠতে পারে এ দুঃসময়ে।

'আচ্ছা, জাল দিয়ে ছোট্ট একটা ঘর ঘিরলে হয় না ?'

সৌদামিনী বলেছে, 'না। জালের কোলে মাথা কুটে কুটে ওরা মরে যাবে যে ! তার চেয়ে রোজ বাগানে এসে দেখব চুপি চুপি।'

'সেই ভাল—আমিও আসব।'

বলতে বলতেই গদাই আহত হল একটা লেবু কাঁটায়। দিল সৌদামিনী একটা খোঁচা। দিয়েই পালাল বাড়ির দিকে হাসতে হাসতে।

গদাই ফিরল কাঁদতে কাঁদতে।

এমনি গদাইর বহুদিনই গেছে। অনেক অসহ্য ব্যথা ও সহ্য করেছে সৌদামিনীর—অনেক অহেতুক কৌতুক। কিন্তু আজ সবই বেয়াড়া ঠেকছে যেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেমন যেন একটা মেঘ করে এলো। হঠাৎ একটা হাওয়া ছুটল। দুলে দুলে নেচে উঠল গাছপালাগুলো। উঠানে টানান সামিয়ানা খানা সামলাতে সামলাতে তার ভিতর ঢুকে পড়ল পাগলা হাওয়া। নৌকার পালের গায় যেমন করে ধাক্কা দেয়, তেমনি গোটাছয়েক হিচকানি, ব্যস ! একেবারে লণ্ডভণ্ড—কয়েক মুহূর্তে প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। সামিয়ানা গাছের মাথায়। গান সেদিন বন্ধ রইল।

সন্ধ্যার পরই আবার ফুটফুটে রাত। ঝকঝকে আকাশ।

বৃন্দা একান্তে গোলককে ডেকে বলল, 'যা।'

'না, এখন নয়।'

'কেন?'

'ভয় করছে বুড়োকে।'

'বাঁশীটা নিয়ে যা, তা হলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না।'

'তুমি তো চেন না—আমরা এক গাঁয়ের লোক। ওকে ডরায় গাঁয়ের সবাই।'

বৃন্দা যেন কেমন করে একটু মুখ বাঁকাল। কতখানি অবজ্ঞা না হাসি ফুটে উঠল তা গোলক বুঝল না।

'তোর যেতেই হবে—এই নে বাঁশী।'

গোলক আপত্তি করতে গেল। না, না···

'ফের না, না।' একটা ধমক দিল বৃন্দা। 'ও সব চলবে না আমার দলে থাকতে গেলে।'

অগত্যা হাতে বাঁশাটা নিয়ে উঠে পড়ল গোলক।

'ভালবাসা মুখের কথা নয়—যদি না ত্যাগ কর লজ্জা সরম· ভয়। আমার তো কিছু নয় গোলক, যা বলছি তা তোরই জন্য।'

গভীর রাত্রে গোলকের বাঁশীর মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে পড়ল রন্ধ্র বেয়ে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি চাঁদ ও তারা সমেত ছায়া ফেলেছে পুকুরের স্বচ্ছ জলে। কখনও বা কাঁপছে, কখনও বা ঝিলমিল করছে—আবার হয়ত স্থির হয়ে রইল সে ছায়া। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কৃষ্ণ সেজে গোলক বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। জগৎ যেন মোহিত হয়ে রয়েছে। কান পেতে যেন শুনছে ছায়াপথ-চন্দ্র-তারা।

রাধা আর ঠিক থাকতে পারল না। সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। একবস্ত্রা নারী, জাতি, কুল, মানের কথা ভুলে এসে দাঁড়াল গোলকের কাছে। ভুলল আভিজাত্যের হিসাব। ছিঁড়ল সব বাঁধন।

রাধাকে দেখে গোলক বাঁশা থামাল।

'না না থামাসনে বাঁশী, বাজিয়ে যা, বাজিয়ে যা গোলক।'

গোলক আবার বাঁশীর রন্ধ্রপথে অমিয় ছড়াতে লাগল। দ্যুলোক

ভূলোক যেন কাঁপতে লাগল রাধার চোখে। সে মন্ত্রমুগ্ধার মত আরও এগিয়ে এলো গোলকের কাছে। 'আমি তোকে আর ছাড়িব না।' বলে হাত ধরল রাধা।

'কিন্তু তা পারবে না রাধাদিদি, আমি রয়েছি।' বলে গদাই দুজনের সুমুখে এসে দাঁড়াল।

ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল।

ঠিক এমনি সময় খালের একটা নির্জন বাঁকে—বড় ছৈলাবনের তলে বৃন্দার নৌকায় বসে বৃদ্ধ মামা তামাক টানছে। বিলোল বাস বেশে, শিথিল অঙ্গাবরণে তার পাশে শ্রমকাতরা বৃন্দা চোখ বুঁজে এলিয়ে রয়েছে।

এযাত্রায় বৃন্দা মামাকে গান শুনিয়ে যতটা ধন্য করতে পারুক কি না পারুক, অন্যভাবে তাকে অপর্যাপ্ত তুষ্ট করেছে।

'এখন তবে যাই, অন্য আর একদিন, বুঝলে কিনা, আসব। পরিচয় আজ হয়ে রইল—এখন হয়ত আর ভুলবে না আমাকে। কি বলো?'

'ভোলার মত তো আপনার কিছু হয় নি—এখনও লিপ্সা আছে প্রচুর। বসুন, আর একটু তামাক খান। যাওয়ার জন্য ব্যস্ত কি!'

'তা বটে, ব্যস্ত নেই তেমন—কিন্তু রাত্তির হয়েছে অনেক। বাড়ির লোকেরা…'

'সন্দেহ করবে? তবে যান—কেন আমি অহেতুক নষ্ট করব মানীর মান।'

বুড়ো উঠে গেল। গান আরও দুচার পালা হবে।

এলো গোলক।

'কি রে?'

'গদাই যেন কি করে টের পেয়ে এসে ওঁৎ পেতে ছিল। পারলাম না।'

'পারবি কেন, ভাল তো বাসিস নে। মিছামিছিই আমাকে খাটালি!'

গোলক বৃন্দার কথার রহস্য ভেদ করতে পারে না। প্রয়োজনটা কার বেশি—তার, না বৃন্দার? বৃন্দা কি শুধু গোলকের জন্য পথ পরিষ্কার করে দিতেই উন্মুখ?

'গোলক ভালবাসতে শেখ, নইলে লাজ সরম ভয় পদে পদে বাধা জন্মাবে। নিজে না মজলে অপরে কি করতে পারে?'

সত্যই গোলকের মনে একটা ধাঁধাঁ জন্মাল। ওর জন্যই তো বৃন্দা ব্যাকুল। রাধা তো আকুল অনেক কাল ধরে। ওকে কতবার কত ভাবে প্রেম জানিয়েছে সে। ওর মনেও দোলা লেগেছে। কিন্তু সাহস পায়নি ও এগোতে। ও তুচ্ছ নাপিতের ছেলে আর সৌদামিনী কিনা রাজার ভাগনী—যার নিত্য মুখ মাজা হয় দুধের সর দিয়ে। চুল বাঁধে ফুলেল তেল দিয়ে।

পরদিন গানের আসরে পাঠ বলতে বলতে গোলক লক্ষ্য করল যে সৌদামিনী একেবারে এগিয়ে এসে বসল সুমুখে। ডেলাইটের উজ্জ্বল আলোকে যে মুখখানা দেখল গোলক তা লোভনীয়ই বটে। তাদের দলে একটি মেয়েও নেই ওর মত।

কিন্তু মিটির মিটির করে দুটি ক্ষুদ্র চোখ একখানা কুরূপ মুখের ওপর থেকে যেন সজাগ প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে। গোলক তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। এবার তার বাঁশীতে অনবদ্য মূর্চ্ছনা ভরে ছড়াতে লাগল চারদিকে।

লোকে বাহবা দিয়ে উঠল। সৌদামিনী মূর্চ্ছিতা হওয়ার জোগাড়। কেউ কেউ একেবারে কেঁদেই ফেলল ভরা আসরে।

গদাই ভাবল ছুটে গিয়ে ভেঙে ফেলে দেয় বাঁশের বাঁশীটা। সে উঠেও দাঁড়াল শক্ত হয়ে। একবার এদিকে ঘুরলেই হয়! গোলকের চোখের সেই মনোরম ভাব আর সকলের কাছে যাই ঠেকুক, ও বুঝল যে স্রেফ গাঁজার নেশা—ঘুচিয়ে দেবে এক বিষম আঘাতে।

সৌদামিনীকে নিয়ে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো। একটু বাদেই আবার শোনা গেল কিছু নয়, কিছু নয়। পরপর রাত জেগে ওর কেমন জানি হয়েছিল। ওকে বাড়ির ভিতর পাঠিয়ে দেওয়া হলো—

খাবে ডাবের জল দিয়ে মিশ্রির সরবৎ। এই হৈ-হেল্লাতে গদাইর উদ্ধত ক্রোধ থেমে গেল।

পরদিন রাত্রে আবারও গান হওয়ার কথা। গোলক একেবারে আসরটা মজিয়ে দিয়েছিল। তাই ওকে দেখে গাঁয়ের চেনা মেয়েরা পর্যন্ত ফাকুর-ফুকুর করতে লাগল। কি চোখ, কি নাক! বাহার কত চুলে!

গদাই ভাবল, একটা নেশাখোরকে নিয়ে এত মাতামাতি! কপাল পুড়েছে গাঁয়ের। গোলক যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই গিয়ে এমন সব মানী লোকের কাছে এমন সব আসনে বসছে যে ওর চৌদ্দ পুরুষেও তা কল্পনা করতে পারে না। আনন্দের আতিশয্যে গোলকের বাপ তো স্মৃতিতীর্থের গালই কেটে ফেলল খানিকটা। অবশ্য গোলক স্মৃতিতীর্থের পাশে বসা থাকলেও তিনি তক্ষুনি ঝাল তুলে নিলেন আচ্ছা করে। স্মৃতিতীর্থের দোষ কি, শাসনের নাপিতেরই উচিত সংযত থাকা। ওরে বাপরে, গালটা কার!

সন্ধ্যা হতে না হতেই নানা গাঁয়ের মানুষে ভরে গেল আসর। বাতি জ্বলল একটার জায়গায় দুটো। ছেলে মেয়ে বুড়োরা হকচকিয়ে গেল। আজ পালা হবে নৌকা-বিলাস। বৃন্দা সাজবে রাধা। যে চোখে মিশ্রির ছুরি ছিল সে চোখ ক্রমে ভাবালু হয়ে এলো। গোলক বুঝি গলায় পরেছে পারিজাতের মালা। তার দিকে তো চাওয়াই যায় না!

আজ সৌদামিনীও সেজেছে অপূর্ব হয়ে। ভেলভেটের ব্লাউজ, দামী ডুরিয়াই, চোখে দিয়েছে ক্ষীণ কাজলের স্পর্শ। কাল ভুজঙ্গিনীর মত খোঁপায়, হাহা করছে কটি সাদা ফুল।

এ যে রূপের হাট। ঠাট এবং গমকের জৌলুস। এখানে গদাইর স্থান কোথায়? রূপ তো বিধাতা তাকে দেয়ই নি। তার তো একখানা সুন্দর কাপড়ও নেই—না আছে জামা একটা। এ তো অর্থাভাব। ও যদি এই পরম মুহূর্তে ওর দেহের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে—মাথার সহস্র বিন্দু ঘাম পায় ফেলে একখানা শুভ্র বসন,

একটি দামী জামা জোগাড় করতে পারত! অথবা ভগবান দিত একটি রাত্রির জন্য সংগীতের সম্মোহিনী শক্তি ওর কণ্ঠে! এত আলো, এত উৎসাহের সভা ত্যাগ করে ওর যেতে ইচ্ছা করল মনুষ্য বিরল অন্ধকার ঘন সন্নিবিষ্ট সুপারি বাগে। ও গেলও চলে তাই— গিয়ে বসেই রইল একটা মরা গাছের মাথির ওপর।

সৌদামিনীর চোখের সুমুখে যখন সহস্র জৌলুস, অজস্র লোভানী তখন গদাইর চোখের চারিদিকে শুধু নিস্তব্ধ অন্ধকার, নিঃসঙ্গ বনানী!

ও যখন হাসছে, এ তখন কাঁদছে।

অর্থ কি রোজগার করতে পারে না গদাই? গান কি শেখা যায় না। রূপ না হয় বিধাতা কারসাজি করে ওকে দেয়নি, কিন্তু চেষ্টা ও যত্নে আর ছুটোর অধিকারী তো ও হতে পারে।

গদাই চিন্তা করল, আর নয়—ও ছাড়বে দেশ। থাকবে গিয়ে এক গানের দলে। না হয় প্রথম প্রথম তামাক সাজবে, প্রয়োজন হলে এগিয়ে দেবে অধিকারীর জুতা খড়ম—গাইয়ে ছেলের নেশার সামগ্রী।

গান শিখে ও সসম্মানে দেশে ফিরবে। ফিরবে কিছু পয়সা করে—মানুষের মত মানুষ হয়ে।

গদাই সত্য সত্যই উঠে হাঁটা ধরল। ছাড়িয়ে গেল গ্রামের সীমানা, পার হলো এক ধানী মাঠ। তারপর তাকে আর দেখা গেল না। জ্যোৎস্না কিছু ছিল—কিন্তু তাতে আর ঠাহর করা যায় কতদূর! আর ঠাহর করার আছেই বা কে?

গদাই ধীরে ধীরে মুছে গেল প্রান্তরের পটভূমি থেকে।

সৌদামিনী তখন উৎফুল্ল। উৎফুল্ল আলোতে নয়, এক নায়ের ছৈয়ের নিচে অন্ধকারে। চলেছে গোলকের সঙ্গে কুলে কলঙ্ক দিয়ে।

আসরের সেই আলোর ভিতর এক ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে ও এসে মিলেছে গোলকের সঙ্গে।

অনেকক্ষণ আসরে কৃষ্ণ নেই। উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে জনতা। ঘণ্টা খানেক অমনি কেটে গেল।

বৃন্দা এসে কেঁদে পড়ল মামার পায়। সর্বনাশ করেছে গোলক।

'কোথায় গেল? কোথায় গেল?'

একখানা ডিঙি পাওয়া যাচ্ছে না। 'পাঠাও খোঁজারু।'

এদিকে যে রাধাও উধাও!

অবাক হয়ে রইল এই সংগীত মুখরিত গ্রামখানা।

অধোমুখে বসে রইল মামা ও বৃন্দা। বৃন্দা চায় বিদায়—মামা চায় তীক্ষ্ণ হলাহল। চঞ্চল হয়ে উঠল নিন্দুকেরা।

চার

চাঁদ তখনও অস্ত যায় নি, শুধু পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে আলো। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। নিঃশব্দ সঞ্চারে নৌকা এগিয়ে চলেছে। গ্রাম্য খাল ছাড়িয়েছে বহুক্ষণ। চেনা গাঙও ছাড়িয়ে নৌকা এসে পড়ল মত্তা নদীতে। এখানে এসে আর শাখা-প্রশাখা স্থির করা যায় না—শুধু জল। অবিরাম ছলছল করছে। বলতে গেলে বাতাস নেই, তবু শোশানি আছে স্রোতের, পাগলি মেয়ের মত মিছামিছি লাফানি আছে ঢেউয়ের।

'কোথায় চলেছি আমরা ?' এপার থেকে ওপার স্পষ্ট কিছুই নজরে পড়ে না। সৌদামিনী প্রশ্ন করল, 'কোথায় আমরা যাচ্ছি গোলক ?'

রাধে গো বলতে নারি···

চলেছি অকূলে

গোকুল ছেড়ে অকূলে।···

শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নামাখা নদী চিকমিক করে উঠল যেন গোলকের সুরের স্পর্শে। ছোট ছোট ঢেউগুলো যেন ভেঙে পড়ল একটার পর একটা আহ্লাদে। সৌদামিনী বিমুগ্ধ হয়ে রইল। প্রাণ-বন্ধু তো সঙ্গে আছে, ভয় কি ? ভয় ভাবনা তো তারই হাতে তুলে দিয়ে ও তার সঙ্গ নিয়েছে। ওর আর চিন্তা কি ?

সৌদামিনী ভাবল, আর গোলক বাকী রাতটুকু নৌকা বাইল। তার চেয়ে যদি স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে নাও, গোলক এসে ওর কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকত !

মাথায় ওর ময়ূরপাখা, পরনে পীতবাস—ওতো গোলক নয়—ও যে শ্রীনিবাস। শ্রীমতী রাধিকা ওর জন্যই তো উন্মাদিনী। আজ পাড়ি দিয়েছে অকূলে। ভয় কি ওর এই নদীর জলে ?

সীমাহীন নদীর জলে জ্যোৎস্না মিশে যেতে লাগল প্রথম প্রভাতী আলোর সঙ্গে—ঠিক অমনি ভাবে নিজেকে সৌদামিনী মিলিয়ে ফেলতে লাগল শ্রীরাধার সঙ্গে। সে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে চুপ করে রইল নায়ে।

নাও চলল পাড়ি জমিয়ে।

শত হলেও গোলক গেঁয়ো নাপিতের ছেলে। জানবে না কেন এক মাল্লাই একখানা হাল্‌কা ডিঙি বাইতে? ওদের জীবনে ওরা ছোট বড় গাঙে অনেক পাড়ি জমিয়েছে রোদে জলে—আজ তো গাঙভরা স্নিগ্ধ আলো নায়ের বুক-ভরা এক রূপসী।

পর দিনই সময়মত এক গঞ্জের ধারে এসে বৃন্দার নাও ভিড়ল। বৃন্দা হেসে বলল, 'এই তোমাদের মনে ছিল! তা আগে বলনি কেন? আমার যে কান ছুটো কেটে রাখবার জোগাড়।'

সৌদামিনী উত্তরে একটু সলজ্জ হাসি হাসল শুধু।

'ভেবে দেখ, ইচ্ছা হলে বাড়ি ফিরে যেতে পার। কৃষ্ণ নামে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া বড় বিষম দায়।'

সৌদামিনীর অন্তর 'কেন' 'কেন' করে উঠল—দায় কেন? সে তো তার সর্বস্ব দয়িতকে দিয়েছে। কিছু বাকি রেখে ফাঁকি তো সে দিতে চায় না। তার চোখ জোড়া চকচক করে উঠল।

'মনে ব্যথা পেও না—তোমাকে আঘাত দিতে চাইনে। মোহে পড়ে অনেকেই আমাদের দলে আসে। মোহ কাটলে আবার চলে যেতে চায়।'

সৌদামিনীর একি মোহ? না, না তাকে ভুল বোঝা অন্যায়। সে মুগ্ধা, কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিতা। তার অন্তরে বাহিরে সর্ব শরীরে গোলক মহা পুলকে বসে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। নইলে কেন এত কণ্টকিত হয় তার দেহ?

কয়েকদিনের মধ্যেই ওকে একটা ছোটখাট উৎসব করে, কজন প্রভুর সমক্ষে বৈরাগ্যে দীক্ষিত করে নেওয়া হলো এক আখড়ায় বসে।

একজন বৃদ্ধগোছের বৈষ্ণব বলল, 'এখন থেকে তুমি কৃষ্ণপ্রেমে

নিবেদিতা—দলের সঙ্গে দেশে দেশে প্রভু মাহাত্ম্য কীর্তনই তোমার উপজীবিকা।'

কথাগুলির মমার্থ না বুঝলেও সরল চিত্তে যা বুঝল তাই হৃদয়ে গ্রহণ করল সৌদামিনী। আর একটু হাসল নিজের গেরুয়াবাস দেখে। কপালের চন্দনের তিলকটি বড় অভিনব ঠেকল যখন তার প্রতিবিম্ব পড়ল নদীর জলে।

বলতে গেলে এক দেশেরই কথা। দশ গাঁয়ের লোকের মুখে মামার কানে গেল। সে মনে মনে স্থির করল—সৌদামিনী তার কেউ নয় এবং কোনদিন কিছু ছিলও না। আর গোলক এ গাঁয়ে পা দিলে তার হাড় ভেঙে দেওয়া হবে। বৃন্দার ঢপের দল এদেশের নদীতে আর নাও বাইতে পারবে না। ওঃ, মাগী কি বজ্জাৎ!

এমনি করেই বৃন্দার দলে একটি একটি করে গৃহস্থ ঘরের মেয়ে এসে জমেছে—তাদের ঐতিহ্য গেছে মুছে, গোত্রের যোগসূত্র গেছে ছিঁড়ে। কেউ বা নাপিত, কেউ বা ধোপা, কেউ বা ভূঁইমালীর ঘরের মেয়ে। মায়ের মায়া, পিতার স্নেহ, বিধবার বৈশিষ্ট্য, সব ঘুচিয়ে দিয়ে এরা এসে মিশেছে একস্থানে, পরিপূর্ণ করেছে একটি দল—বৃন্দার সখের ঢপের দল। তলিয়ে ভাবতে গেলে হয়ত কারুর কারুর কাছে ঠেকে এরা একটি শোকের কটি যেন অশ্রুবিন্দু। যে প্রাণটিতে কাব্য কিম্বা ললিত রাগিণীর সন্ধান পেয়েছে বৃন্দা অমনি তা কোরকে কৈশোরে অথবা যৌবনে ছিন্ন করে এনেছে। গোলক তার শর, সন্ধানী সে নিজে। বৃন্দা যে লোভেই এ সব কাজ করে থাক— এতগুলো অশ্রুজল বিফল হয়নি। দেশে দেশে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণনাম। শত সহস্র অজ্ঞ মূর্খ নরনারীর হৃদয়ে ঝর্ণা ধারার মত কুলকুলিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি সুমঙ্গল ধারা— বাঙালীর বৈষ্ণবীয় অমিয়,—আদি, বাৎসল্য ও নানা রসের মিশ্র একটি স্রোত।

দিন যায়, গান গায় সৌদামিনী। সে ভাবে বিভোর হয়ে এমন ভাবে আত্ম-নিবেদন করে যে আসরভরা লোক একেবারে মজে যায়

তার অভিনয়ে। এখন আর বৃন্দার দলের বায়না ফুরায় না। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

একদিন সৌদামিনী টের পেল যে গোলক গাঁজা খায়। 'তুই এসব করিস কি গোলক—তোর কি সাজে নেশা করা ?'

'কে বললে এ কথা, কে ?'

'আমি যে দেখলাম।'

'ভুল দেখেছিস—ঐ ভুলেই তো মানুষ মরে।' সে একটি গানের কলি গেয়ে শুনিয়ে দিল—

ভুলের বশে তুমি ভুল করো না···

সৌদামিনী স্বস্তি বোধ করল। বিশ্বাস করল ওকে।

এখন গোলকের প্রায় রাত্রিই কাটে সৌদামিনীর নায়ে। আসর ভাঙলে ও এসে শুয়ে পড়ে সৌদামিনীর শয্যায়। গোলক নাপিতের ছেলে—ছোটকাল থেকে নানা দলে ঘুরে ঘাঘি (ঝুনো) হয়ে গেছে। সৌদামিনীর রচিত শয্যা বড় লোভনীয় ঠেকে গোলকের কাছে। ওর অভিনয় যে মিছে নয়, একথা বুঝতে পারে না রাধা। বাকি রাতটুকুর জন্য সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। সে হর্ষে আনন্দে কী শান্তিতে যে দিন কাটায়! মাস আসে, মাস কেটে যায়।

সৌদামিনী মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিল। দিনের বেলা ও আর অন্য নায়ে বড় একটা যায় না, মেলামেশা করে না অপর মেয়েদের সঙ্গে। সে রাধাকৃষ্ণের একখানা পট সংগ্রহ করে, ভজন গায়, কীর্তন গায়, সারা শরীরে দেয় হরিনামের ছাপ। ওর দেহ মন পবিত্র হয়ে উঠল প্রেমে।

বৃন্দা চিন্তিত হলো। 'এসব তুমি কি করছ রাধা ?'

'কেন, ক্ষতি তো হচ্ছে না কারুর—দল তো চলছে ঠিকই।'

'না লো, তা বলছি নে—বলছি কিনা, এই বয়সে তুমি···' আর বেশী কিছু বলতে পারল না সৌদামিনীকে। ওর কথায় কথায় গলা ধরে আসে। মনে হলো বৃন্দার ও যেন সত্যই রাধা হয়েছে।

একটি শান্ত স্নিগ্ধ আলো যেন জ্বলেছে ওর মনে। সে আলো সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার। এত মেয়ে তার নৌকায় এসেছে, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে—খেয়েছে মদ, মাংস, তাড়ি, কিন্তু সৌদামিনী যে সম্পূর্ণ পৃথক হলো! একমাত্র গোলক ছাড়া মিশল না কারুর সঙ্গেই। সেও আবার গোলককে নিজের সব কিছু উৎসর্গ করল কৃষ্ণ ভেবে। তীক্ষ্ণধী বৃন্দা সব বুঝল, বুঝল যে এই ঢপের দলের পঙ্কে একটি পদ্ম জন্মেছে—তবু তার ভাবনা হলো বিষম।

এ মেয়ে তো টিঁকবে না—একটু নাড়া লাগলেই যে খসে পড়বে এ পদ্মের সহস্র দল।

সব যখন বুঝবে ও তখন চলে যাবে দল ছেড়ে।

তখন উপায় হবে কি ?

ওর তপস্যা ভাঙতে হবে। ওকে আনতে হবে আর পাঁচটি মেয়ের পংক্তিতে টেনে নামিয়ে। একদিন বৃন্দাও অমনি নিষ্পাপ ছিল।

যত অনর্থের মূল যে অর্থ, যার বিনিয়ন্ত্রণের দোষে এমন যে ধর্ম তাও দুষ্ট হয়—সেই অর্থেরই ঘটল বিশেষ অনটন। এলো বর্ষাকাল। এখন আর বায়না নেই। দল দিতে হবে ভেঙে। রোজগার এবার যা হয়েছিল তা মন্দ নয়—কিন্তু একটি পয়সাও হাতে নেই বৃন্দার। তারপর যা কিছু আছে, তা সে হাত ছাড়া করে কি করে ? একটা যন্ত্রণা রয়েছে নায়ে, পুষতে হবে সারা বর্ষা। অন্য সবাই বাড়ি যাবে, সৌদামিনী তো আর কোথাও যাবে না। সেই উপলক্ষে গোলককেও রাখতে হবে ফুরন (ঠিকা) করে।

নিজের জন্য বৃন্দা ভাবে না, ভাবনা হতো না অন্য কেউ বাড়ি না গেলে। একটা গঞ্জের মহাজন পট্টির ঘাটে নাও রাখলে দিন কেটে যেত। বৈষ্ণবীর নায়ে রসদ আসত অনেক।

বিনিময়ে গুটিদুয়েক ঝিকিমিকি হাসি। গভীর রাত্রে একটু মাত্র পরিশ্রম। দল চালনার চেয়ে ঢের খাটুনি কম। তবে দল দল করে কেন বৃন্দা ?

নিন্দার ডরে, গৌরবের আকাঙ্ক্ষায়।

এসব ব্যাপারে সৌদামিনীর উৎসাহ নেই—আছে পট এবং ফুল নিয়ে। নইলে দু ভগ্নীতে মন বেঁধে খাটলে আগামী আয়ামে না করা যেত কি? দলের বাইন-গাইন অনেক কিছু ঝেড়ে নতুন করে ফেলা যেত। পয়সার কি আর অভাব হতো?

বৃন্দার মন সহানুভূতির জন্য যেন নরম হয়ে পড়ে। সৌদামিনীর গলা জড়িয়ে তার বলতে ইচ্ছা করে, 'আয় বোন, তোর যৌবন দিয়ে হবে কি—আয় দুজনে মিলে একটু গা লাগিয়ে খাটি। ওরা যদি দেশে যায়, যাক। আসছে আয়ামে ওদের আর নেব না—বাছাই-বদলাই করে গড়ব নতুন দল।'

কিন্তু সৌদামিনী পোড়ারমুখি বুঝবে কি বৃন্দার অন্তরের ব্যথা?

কষ্ট করেই দলের লোকজনকে বিদায় দিল বৃন্দা। টাকাগুলো দিতে বুক টনটনিয়ে উঠল।

দলের সবার খাটুনীর মাসুল জমেছিল তো যমের হাতে গিয়ে। একটা অসন্তোষ, ফোঁপানি, গনগনানির পালা সাঙ্গ করে তবে বৃন্দা ছাড়ল হাতের পুঁজি। বৃন্দা ভাবে ওর রক্ত যেন শুষে নিল ওরা। ওরা ভাবে ওদের ন্যায্য শ্রমের মূল্য কেড়ে নিতে চায় বৃন্দারূপী মহাজন। ওর অভাব কি? টাকা পয়সা যা থাক কি না থাক, আছে তড়িৎ লতার মত যৌবন। ওর আবার খাই-খোরাকির চিন্তা! এদেশে বর্ষা থাকবে খুব জোর চার মাস। বারমাস বর্ষা হলেই বা ওর ভয় কি? দল না চালিয়েও ও ইচ্ছা করলে দরদালানের পত্তন করতে পারে।

রইল শুধু গোলক। তাকেও একদিন শক্ত একটা চাপ দিল বৃন্দা। গোলক গা ঢাকা দিল।

একেবারে আকুল হয়ে উঠল সৌদামিনী।

'দেশে গেছে, এলো বলে। এত আকুলি-বিকুলি করছিস কার জন্য? একটা নেশাখোর লম্পট, ওর কি আছে কথার ঠিক!'

'বলো কি, মাতাল লম্পট!'

সৌদামিনীর মুখখানার দিকে চেয়ে বৃন্দারও মনটা ছ্যাঁক করে উঠল। 'না লো, না—তা নয় ঠিক—তবে কিনা বড্ড ধূর্ত।'

'আমার সঙ্গে চাতুরী করবে কেন দিদি ?'

মুস্কিল উত্তর দেওয়া। 'পুরুষ জাতের কথা ভাই আর বলিস নে আমায়।' বৃন্দা কৌশল করে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করল, 'দেখিস নে শ্রীরাধার অবস্থা, কাঁদতে কাঁদতে জনম গেল।'

'তবু তো রাই কৃষ্ণ দর্শনের আশা কখনও ত্যাগ করেনি দিদি।' সৌদামিনী সুর করে গাইল—

সর্ব অঙ্গ খেও রে কাক
না রাখিও বাকি
শুধু কৃষ্ণ দরশন আশে
রেখো দুটি আঁখি···

একি গান! একি অদ্ভুত প্রেম! সৌদামিনীর মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে রইল বৃন্দা। এত জলও কি মানুষের চোখে থাকে? এ প্রস্রবণ কোথা থেকে উন্মুক্ত হল তা ভেবে স্থির করতে পারে না বৃন্দা। শত সহস্রবার সে এ গান শুনেছে, কিন্তু এমন করে তো কোন দিন তার মনে দাগ কাটেনি।

নিচে খালের জলে নৌকা—কূলে একখানা বাংলো ফ্যাসানের টিনের ঘর। নানা নক্সি এবং জংলি লতাপাতা আঁকা খোলা বারান্দাগুলো। কাঠের পাটাতনে এবং আভরণে বহু কারুকার্য করেছে এদেশের মিস্ত্রীরা। লোকে বলে—বেনে-পট্টির বংশীদাস বাবুর হাওয়া-মহল। ব্যবসায় লাভ হয় প্রচুর, তাই রং তামাশা চলে সর্বক্ষণ। যত ফাজিল উঠাত বয়সের সাহা ও কুণ্ডুর ছেলেগুলো এখানে এসে মদ মাংসের আদ্যশ্রাদ্ধ করে—তখন হয়ত তাদের প্রাচীন-পন্থী বাপ পিতামহ হরিনাম করতে ব্যস্ত, ব্যস্ত ফোঁটা তিলক কেটে হিসেবের তেরিজ নিয়ে। তারাও অবশ্য আনন্দ করে, তবে সুরার বদলে পান করে সুধা—মনোমোহিনী অথবা বৃন্দা বৈষ্ণবীর মুখ-চন্দ্র-সুধা। একটা চলে ধর্মের মাধ্যমে, আর একটা আধুনিক পথে। যা পূর্বে ছিল, তা এখনও আছে—হয়ত ভবিষ্যতেও তা

থাকবে, শুধু রকম ফের হবে ভোগের। সমাজ না বদলালে হয়ত কিছুই বদলাবে না।

সৌদামিনীর গান যখন চোখের জলে ও খালের জলে ভিজে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে আরম্ভ করল তখন একটি বাতায়ন খুলে গেল হাওয়া-মহলের। বংশীদাস বাবু একবার নিচের দিকে চেয়ে দেখলেন।

চোখাচোখি হলো বৃন্দার সঙ্গে। সে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসল ছৈয়ের বাইরে এসে।

সেদিন পাঁচ সাত দফা লোক এলো হাওয়া-মহল থেকে। যারা এলো তারা নাম করা পাকা কয়াল (দালাল)—কেনাবেচা করে সাচ্চা মালের।

সন্ধ্যাবেলা বৃন্দা বলল, 'আয় বোন আমরা একটা কাজ করি।'

'কি কাজ দিদি।'

'চুল-টুল তোর বেঁধে দেই, তারপর বলব। ধীরে সুস্থে শুনবি, শুনে জবাব দিবি।' তখনি বলতে পারত বৃন্দা, কিন্তু কেমন যেন সংকোচ বোধ করল। 'ঐ আমাদের গোলকটা কি মানুষ ভাই, একেবারে নরপশু। কতদিন ধরে পা দুখানায়ও দেখি একটু আলতার ছোঁয়া দিস নি। এত মনমরা হয়ে থাকলে চলে?'

'কি করতে হবে দিদি তা তো বললে না?'

সৌদামিনীকে সাজিয়ে দিল বৃন্দা। পায়ের আলতা একটু ঠোঁটে মাখতে গেল, সৌদামিনী হাত চেপে ধরল। 'এ সব কি?'

'একটা বায়না আছে।' বৃন্দা মুখ টিপে হাসল।

গোলক নেই, না আছে দোহার বাইন, না আছে একটিও গাইন—বায়না! বোকার মত বিস্মিত হয়ে থাকে সৌদামিনী।

সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি বর্ষাও যে বৈষ্ণবীর ঢপের দলের নায়ে কাটায়নি, জানেনি হরিনামের জ্বালা কোথায়, জন্ম কোন্ মৃত্তিকায়, সে তো বিস্মিত হবেই। চিরন্তনী জীবনের ধারায় দুর্যোগ আসবেই, নামবেই আকাশ ভেঙে বাদল—তার সুযোগও নেবে

একদল মানুষ। তবু গরলে অমিয় জন্মে, পঙ্কে জন্মে শতদল। তাই আজও হরিনাম বেঁচে আছে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানারূপে ধর্ম মর্মমূলে মিশে যাচ্ছে। প্রেম এবং পূর্ণতার জন্য মানুষ চলেছে এগিয়ে। বিরামহীন তার গতি, বিরতিহীন তার প্রয়াস।

'দিদি কি বললে তা তো বুঝলাম না।'

'বোকা মেয়ে, না বুঝলে চুপ করে থাক।'

সৌদামিনী চুপ করেই রাত্রে ঘুমিয়েছিল। তবে একটু ভেবেছিল গোলকের কথা—স্বপ্নে গোলক কাছে এলো। গভীর রাত্রে চুমো খেল তার মুখে।

'কে, কে, কে—?'

'চিনতে পারছ না ধনি ?'

'কে আপনি ? কেন এলেন আমার নায়ে ?' চোরকে যেমন করে গেরেপ্তার করে, তেমনি করে সৌদামিনী জড়িয়ে ধরল আগন্তুককে। ভয়ে বিস্ময়ে সে তখন অধীর।

একটা টর্চ জ্বলল। বিপন্ন আগন্তুক চাপা গলায় বলল, 'আমি বংশীদাসবাবু। ভয় পেও না, ছাড়ো।' এই পরিচয়ের মধ্যেই যেন এমন একটা ছাড়পত্র রয়েছে যা এ বন্দরে সকলের জ্ঞাত।

কিন্তু সৌদামিনী ছাড়ল না। সে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করল, 'কে আপনাকে হুকুম দিল এ নায়ে আসতে ?'

'বৃন্দা। কেন তুমি জান না ?'

'ডাকুন তাকে।'

কতখানি ক্রুদ্ধ হয়েছে সৌদামিনী তা বংশীদাসবাবু বুঝতে পারলেন না অন্ধকারে। টর্চ জ্বালাতেও সাহস হলো না। 'তোমার মত অরসিক তো আর দেখিনি ভাই! এখন কি এ নায়ে তার থাকার কথা ?'

'তবু তাকে চাই,—আমি শুধাব, সত্যিই কি দিদি হুকুম দিয়েছে আপনাকে, না আপনি এসেছেন কু-খেয়ালে ? দিদি, দিদি!'

আসামী ছেড়ে সৌদামিনী বিস্রস্ত বাসে ছৈয়ের বাইরে বেরিয়ে এলো।
'দিদি, দিদি!'

বংশীদাসবাবুর নজরে এমন খাপছাড়া অস্ত্র পড়েনি কখনও—এখন যে নাক কানের মান রাখা দায়। বৃন্দা গেল কোথায়?

বৃন্দা অন্ধকারেই কূলে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সাড়া দিতে সাহস হল না তার। সৌদামিনী তাকে ডাকতে ডাকতে নৌকার গলুইতে পা দিয়ে ওপরে উঠল। গঞ্জের নিস্তব্ধ খাল, সুপ্ত নৌকার বহর, উঁচু হাওয়া মহল যেন নির্বাক হয়ে রইল।

'দিদি, দিদি!' গঞ্জের খাল পারে শুধু প্রতিধ্বনি শোনা গেল—ফিরে এলো সে ধ্বনি আরও মর্মান্তিক হয়ে যেন।

এ ডাকে কি ছিল তা বৃন্দা বলতে পারে না, শুধু তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, তবু জবাব বের হলো না মুখ থেকে। ডাক ক্রমে দূরে চলে গেল।

পাঁচ

বাড়ি ছেড়ে গদাই বাইরে বেরিয়ে এসে হরেক রকম কাজ করেছে। গানের দলে কয়েকবার ঢুঁ মারতে চেষ্টা করে মিছামিছিই লাঞ্ছিত হয়েছে। কোন দলের মেয়েরা বলেছে, 'এমন কাত্তিকের মত কেষ্ট নইলে কি প্রেম জন্মে।' কোন দলের শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং সুর করে বলেছে, 'তোমায় দেখে, আজ থেকে, বাঁশী ছাড়ব হে।...'

গদাই বুঝেছে শ্রীহীনতাই তার বড় অপরাধ। তবু সে ঢপের দলের গান হবে শুনলে দশটা বড় খালও একা একা সাঁতরে পার হয়ে গেছে। ঢপ কীর্তনের নেশায় ও মসগুল।

একবার এক বন্দরে হচ্ছিল নিমাই সন্ন্যাস পালা। তামাক পট্টির বারচালা একেবারে ভরে গেছে মানুষে। সেদিন ছিল হাট বার। দিনের হাট ভাঙতে ভাঙতেই বসল যেন আবার রাতের হাট। ধোপা, নাপিত, কলু, কেরায়ার মাঝি, ছোট বড় নানা কিসিমের দোকানদার ও পাইকারে বারচালা সন্ধ্যা হতে না হতেই পূর্ণ হয়ে গেল। আজকার নতুন আকর্ষণ নিমাই সন্ন্যাসে—নিমাই সাজবে নাকি একটি মেয়ে। এসেছে যেন কোন দল থেকে টাটকা এদলে। নামটা জানার লোভ হলো গদাইর।

বছর প্রায় দুটোর বেশি ঘুরল। গদাই গাধার মত পরিশ্রম করে হাতে কিছু পয়সা জমিয়েছিল। কখন করেছে ঠিকা মাঝির কাজ, কখন দিন কাটিয়েছে পানের বরজে কৃষাণ খেটে। ঘন বর্ষায়ও সে বসে থাকে নি। সে গিয়ে তামাক পট্টির গুদামে ঢুকে গাঁট গুছিয়ে দিয়েছে—দিয়েছে শুকনা তামাকে জলের ভেজাল দিয়ে মাপে ভারি করে। মহাজনরা সন্তুষ্ট হয়ে গদাইকে বলেছে, 'সরকার হয়ে তুমি এখানের সব কুলি খাটাও।'

গদাই জবাব দিয়েছে, 'না এজ্ঞে।'

আর কিছু পয়সা হলেই সে উত্তুরে মাঝিদের কাছ থেকে একখানা নৌকা কিনবে। কম দামে সে কিনতে পারবে এক ম'ল্লাই একখানা ডিঙি, একটু সুযোগ মত দর করে। গানের দলে তার গাইয়ে হিসেবে স্থান না হলেও, বাইয়ে হিসেবে আদর হবে যথেষ্ট। একবার ঢুকতে পারলে হয়।

তারপর গদাই যেদিন নাও কিনল, বন্দরে সেদিনই বুঝি এলো নিমাই সন্ন্যাসের দল। মেয়ে-গাইন নিমাই সাজবে—মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল হাটে। ফলে বারচালায় ভিড় হলো প্রচুর। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা হলো প্রায় সমান সমান। অনেক ব্যাপারী বাড়ি ফেরেনি। বন্দরের কোলে নাও ভিড়িয়ে নাস্তা করে বারচালায় এসে জমেছে। এলাহি খোন্দকারের ছেলে দুআনা দিয়ে একশিশি আতর কিনল, চোখে দিল চার পয়সার সুর্মা। আজ রাতটা তার কাছে রঙিন ঠেকল—যেন পরীরা পাখা মেলে এখনি নামবে ঐ রোশনাই ভরা বারচালায়। সে তার আধ ময়লা কামিজটা বার কয়েক ঝাড়ল। এখন ঘামের গন্ধটা যেন অনেকটা ঢাকা পড়েছে 'বাদশাহী' আতরে।

গান আরম্ভ হয়ে গেছে। এলাহি খোন্দকারের ছেলে দেখল যেন আসরে এসে ঢুকল একটি সত্যিকারের পরী গেরুয়া পিরাহান্ (জামা) পরে। ও বেমালুম এগিয়ে চলল ভিতরের দিকে। হাটের বরকন্দাজ নাগর খাঁ এগিয়ে এসে ধরল তার কান। 'এই শয়তান, যাও কোথায়? মোচের রোয়া ওঠে নি এখনও, এসেছ আখের (ভবিষ্যত) খোয়াতে।'

খোন্দকারের ছেলে পিছলে সরে এলো—কারণ তার কান দুখানায় ছিল প্রচুর তেল—টাটকা ঘানির তেল। বাপ তার কলু। পরিচয় আছে নাগর খাঁর সঙ্গে।

গদাইর নজরে এ সব পড়ছিল না। সে মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিল নিমাইর দিকে। বলতে গেলে বারচালার বাইরেই সে বসেছে, স্থান

সংকুলান হয়নি শতরঞ্জির আসরে। মাঝি মাল্লা কামলা মজুরেরা বসেছে গিয়ে পেঁয়াজ রসুনের খোসার ওপর ধূলায়, ছেঁড়া হোগলার এক প্রান্তে। তবু রস ঘনিয়ে আসছিল ওদের চোখে। ওরা নিমাইকে চেনে—বৈরাগ্যের পূর্ণ মূর্তি এই যুবক। একে দেখেছে বহু আসরে, তবু আজও দেখতে ভাল লাগে। এই অজ্ঞ মূর্খ হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ কিছুক্ষণের জন্য হিংসা দ্বেষ ভুলে যায়, ভাবে বিভোর হয়ে সত্য সত্যই বুক ভিজিয়ে ফেলে। কেউ বা আকুল হয় শচী মাতার জন্য, কেউ বা অধীর হয় ঘুমন্ত নব-বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য—কারুর কারুর নিমাইর জন্য হুহু করে ওঠে বুক। আজকার নিমাই সত্যিই অতি অপরূপ! মর্তের মানুষ নয়, নিশ্চয় স্বর্গের কোন সুঠাম সুন্দর দেব পুরুষ, নেমেছে ধরাতলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভিজিয়ে যাবে প্রেমাশ্রু জলে। ঐ ঢলে ঢলে গলে গলে নাচছে, হরিনাম নিয়ে দ্বারে দ্বারে যাচ্ছে। জগা মাধা উদ্ধার হলো—উদ্ধত কাজী আত্ম সমর্পণ করল। গদাই ভুলে হরিবোল বলে গলা জড়িয়ে ধরল্ এলাহি খোন্দকারের ছেলের।

এখনও কত বাকি। গদাই আজ বুঝি আর বাঁচবে না

ছয়

গান থামল। গদাই উঠল, ফিরে চলল নায়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল লোক এলো। 'মাঝি একটু পার করে দিতে পার ওপার।'

গদাইর কিছুই ভাল লাগছিল না। একটা কিসের যেন ব্যথায় বুকটা টনটন করছিল। এ জগৎ মায়া মোহময়—অসার নাকি এর সবটাই। তবে সে নাও কিনল কেন? কেন জড়িয়ে পড়ল এই মরাকাষ্ঠের মমতায়। সে তো নিমাইর চাইতেও অতি সহজে গৃহ ত্যাগ করে এসেছে—কেউ তো তার জন্য একবিন্দুও চোখের জল ফেলেনি। বাপ তার বেঁচেছে একটা বোকা ছেলের দায়িত্ব এড়িয়ে। সৌদামিনী হয়ত একটিবারের জন্যও ভাবেইনি তার কথা। বৃথা, বৃথা—সবই তার বৃথা। তবু সে কিনল নাও! তার চাইতে সে যেমন বেরিয়ে এসেছিল, তেমনি যদি এক বস্ত্রে এগিয়ে যেত হরিনামে বিভোর হয়ে, সেই তো ছিল ভাল। নিমাইর সঙ্গে হয়ত পথে দেখা হতো, নয়ত নিতাই তাকে দীক্ষা দিত। কিন্তু তারা যে দেহরক্ষা করেছে। আজ কেন জানি এ কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে মন সরছিল না গদাইর।

গত রাত্রির নিমাই মরতে পার না—আহা অমন সুন্দর নিমাই।

'মেয়েটি কোন্ বাড়ির তা কি জান সর্দ্দারের পো?' একটি প্রৌঢ় মাঝি গদাইর কাছে এসে গলুইর ওপর বসল। 'আগুন আছে, তামাক সেজে এনেছি।...মশাইরা ঝামেলা ক'র না। এ ঘাটের কোনও নেয়ে এবেলা আর কেরায়া বাইবে না।'

'পয়সা বেশি দিলে?'

'তা হলে ইনি না গেলে আমিও যেতে পারি। কিন্তু মশাই

সারা রাত হিমে দাঁড়িয়ে গান শুনেছি। মশাই বড় ঘরের মেয়ে, এঁদের দেশের এক গাঁয়ের,—নইলে অমন আসর মজাতে পারে!'

যাত্রী একটু থতমত খেয়ে গেল। তার দলের আর সবাই চেয়ে রইল। যাত্রীটি জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি কে?'

বন্ধু-মাঝি জবাব দিল, 'কাল মশাই ইনি এই নাও কিনেছেন—সোয়াশ ট্যাকা দিয়ে। একেবারে কাঁচা করকরে ট্যাকা।'

গদাই লজ্জিত হয়ে জবাব দিল, 'না, তা লয় মশাই—ট্যাকা আড়াই কুড়ি।'

'কম হলো বুঝি? যাক গে, একটু আগুন দাও।'

যাত্রীটি প্রশ্ন করল, 'এঁর নাম, ঠিকানা?'

'মশাই, রসের খবর শুনতে হলে দিয়াশলাইটা বের করুন পকেট থেকে। তুমি একটু নারকেলের ছোলা দাও।'

গদাই যেন ফাঁপরে পড়েছিল। সে একটা নারকেলের ছোলার গুল পাকিয়ে এগিয়ে দিয়ে চুপ করে রইল। ঔৎসুক্য এবং বিস্ময় তার মনে উগ্রতম হয়ে উঠেছে। একি সত্য কথা, না রং তামসা?

'তোমার বাড়ি তো ভাই শ্যাওলা, শুনে এলাম সবই। কেন, তুমি কি কিচ্ছু জান না?'

গদাই অধৈর্য হয়ে বলল, 'না, না আমি জানব কি করে—তুমি জেনেছ, বলে ফেল আর না ফেনিয়ে।'

বন্ধু-মাঝি যাত্রীটির দিকে ফিরে বলল, 'আস্থন একটু পেরসাদ করে দাও। আমি ওঁর বাড়ির খপর আদি অন্ত জেনেছি একদিনের পরিচয়ে। যে চোমৎকার নাও কিনেছে বন্ধু।'

গদাই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে যাও যাও, খালি বাজে কথা। আপনি তামাক খেয়ে নিজের কাজে যাও মশাই—ওর হয়েছে মাথার দোষ।' এখন গদাইর কেবলই মনে হতে লাগল গত রাত্রির নিমাই যেন তার একান্ত পরিচিত। গানের টোলটি পর্যন্ত যেন তার চেনে ও। ওতো নিমাই নয়—

'মেয়েটির নাম রাধা। বেরিয়ে এসেছে গোলকের সঙ্গে—প্রতিবেশী এক নাপিতের ছেলে।'

'বলে কি—তারা এখনও আছে?'

'থাকবে না কেন, যাবে কোথায়।'

গদাই লগিটা ধরে একটা টান মেরে এক লাফে কূলে উঠল—ছুটল বার-চালার দিকে। জোরের চোটে লগিটা খুলে নাও তার স্রোতের মুখে পাক খেয়ে ভেসে চলল। পারে যাত্রীর হাতে রইল কল্কি, আর জলে নায়ের ওপর রইল ধূম পিপাসু মাঝি। নৌকাটা আর একটা ঘুরপাক খেল।

গদাই বার-চালায় গিয়ে দেখল ভাঙা আসরে দুটি বন্দরের নির্লজ্জ কুকুর শুয়ে রয়েছে।

গাইন নাকি বায়না ধরে নাও ভাসিয়েছে উত্তরের একখালে। যাবে হোগলাগঞ্জের বিলে।

ফের কেরায়াঘাটে ফিরে এলো গদাই। বন্ধুমাঝি লগিটা হাতে দিল। 'এই নেও তোমার নাও।'

গদাই নৌকা খুলে দিল।

'কোথায় যাও? কেরায়া ধরেছ নাকি?'

'না বন্ধু, আমি আর কেরায়া বাইব না।'

'তা হলে নাও কিনলে কেন?'

গদাই একটু হাসল। 'যাব সন্ন্যাসে।'

কিন্তু একটু বাদেই একটা অনসুরা গান মাঝ নদী থেকে ভেসে এলো—

সন্ন্যাসে না যেওরে নিমাই
বৈরাগী না হয়ো
আগে তোমার বন্দু মরুক
পরে তুমি যেও···

খুব শক্ত বাঁশের একটি পর্বে আঘাত লাগলে যেমন বাকি পর্বগুলো খটাখট খুলে যায়—তেমনি একটি ব্যথায় গদাইর মনের

সবগুলি পর্ব খুলে গেল। এতদিন সে সৌদামিনীর কথা মাঝে মাঝে ভাবলেও ঠিক আকুল হয়ে ভাবেনি। আজ ব্যাকুল হয়ে দুপুর রোদে উজান বেয়ে গাইতে লাগল গান। ঝরতে লাগল ঘাম—উত্তরের বিরোধী বায়ু তো আছেই। নাও সামাল রাখা দায়।

তবু দক্ষ গদাই বৈঠা চালাতে লাগল শক্ত হাতে। সর্ব উপেক্ষিত মুখখানা তার নিজের নজরে পড়ছিল না। সুদৃঢ় মাংসপেশীগুলির অবিরাম নর্তন দেখছিল সে। কি সুন্দর তার দেহ। রংটা কেমন কাঁচা হলুদের মত। তবে রোদে পুড়ে একটু তামাটে হয়েছে। কিন্তু এ দেহের তো মূল্য বুঝল না কেউ।

সে একটা খালে ঢুকে গাছগাছালির আবডালে আবডালে নাও বাইতে লাগল। যাবে হোগলাগঞ্জের বিলের দিকে।

'বাহবা, বাহবা, এক মাল্লাই নেয়ে।' উত্তর থেকে দক্ষিণে যারা নাও ভাটিয়ে গরগর করে নেমে আসছিল তারা বাহবা দিল গদাইকে। 'বেশ ভাই বেশ।'

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গদাই নিমাইর সুকুমার মুখখানার ভাব-বিভোর ছবিখানি স্মরণ করতে করতে সারা খাল মুখরিত করে গেয়ে চলল গান। গলা সাধা নয় তবু অবিরাম গেয়ে চলল গদাই। অস্পষ্টে প্রেয়সী রাধাই বুঝি টানছে ওকে। যাবে সন্ন্যাসে—অনুগমন করবে নিমাইর। আহা কি ঢলঢল লাবণি ওর প্রিয় যোগীর। তবু কি কঠিন তার বুক! কারুকে জিজ্ঞাসা না করে, সকলকে উপেক্ষা করে চলেছে যেদিকে দুচোখ যায়।

একবার রুদ্র আবার মধুর রূপে নিমাই প্রতিফলিত হতে লাগল বোকা গদাইর মনে তাই গদাই আজ তার দেহের ও কণ্ঠের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে গাইতে লাগল গান ও বাইতে লাগল বৈঠা।

উজান জলে সারাদিন নাও বেয়েও গদাই আর বেশি দূর এগোতে পারল না। সন্ধ্যার পরই সে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করতে লাগল। এতটা ক্লান্ত সে কিছুতেই হতো না—গত রাত্রিটা যে তার সম্পূর্ণ বিনিদ্র কেটেছে। গত হয়েছে নিমাইর মুখ চেয়ে।

গদাই নাও ভিড়াল এক ভাঙা মন্দিরের কাছে। কিছু কাঠ সংগ্রহ করতে হবে। অন্ধকারে গাছের শুকনা ডাল চেনা কঠিন। চিনতে পারলে হয়ত ভেঙে আনতে পারত।

একবার গদাই ভাবল যাবে না, রাঁধবে না ভাত। শুয়ে থাকবে শুধু জল খেয়ে। বনের ফলমূল খেয়েই তো সাধু সন্ন্যাসীরা জীবন কাটায়। ও একটা রাতও কি পারবে না একটু কষ্ট করতে। ভোর বেলা ফলফলাদি তো কিছু সংগ্রহ হবেই। আর কিছু না পেলেও নারকেলের অভাব হবে না। কিন্তু নারকেল খেয়ে কদিন থাকা যায়? ও বড় লোভী—ওর ত্যাগ নেই, আছে শুধু ভোগের আকাঙ্ক্ষা। না, ও কিছুতেই উনান ধরাবে না। তার চেয়ে শুয়ে শুয়ে হরির নাম করবে।

শুয়ে পড়ল গদাই একপাত্র জল খেয়ে। ভাঙা মন্দিরের ভাঙা চূড়াটার ওপর দিয়ে একটা পেঁচা ডেকে উঠল, না জানি হেসে উড়ে গেল, ঠিক অনুমান করা গেল না। গদাই আবার উঠে বসল।

গদাইর আজ মনে পড়ল বৃন্দার মুখের একটি গান—

গৌররূপ দেখিয়া হয়েছি পাগল
ঔষধে আর মানে না
চল সজনি যাইগো নদীয়ায়।

গৌর-কাঁটা বিষম কাঁটা
বিঁধলে কাঁটা খসান দায়
গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশিয়াছে
আমার গায়।

সাপের বিষে যেমন তেমন
এ বিষে যে মাথায় ধায়
সর্ব অঙ্গ জরজর, জলে নামলে
দ্বিগুণ জ্বালায়।

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াই
লোকে কত মন্দ কয়
লোকের মন্দ পুষ্প চন্দন
অলংকার করেছি গায় ॥

যে তাল মান লয়ের যোগ বিয়োগে রূপসী বৃন্দা এ সংগীত গেয়েছিল তা নিখুঁতভাবে মনে পড়তে লাগল গদাইর। সেই আসর সেই ভাবমুগ্ধ জনতা দেখা দিল যেন এই নির্জন সন্ধ্যায় খালের চরে। হঠাৎ সে আসর রূপান্তরিত হল হাটের বার-চালায়। কত লোক— গদাই তো দাঁড়াবার স্থান পাচ্ছে না। তবু সে ঠেলাঠেলি করে শুনছে গান।

গৌর-কাঁটা বিষম কাঁটা
বিঁধলে কাঁটা খসান দায়…

এ কি, ভুজঙ্গে দংশন করল নাকি গদাইকে? সে যে মাথা হেঁট করে বৈঠা ধরে রয়েছে? সমস্ত হৃদয় যে তার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মরন্ধ্র ছাপিয়ে উঠল নাকি বিষ? কে ধরবে গদাইকে? গদাই বুঝি বা জলে পড়ে যাবে। যাক, যাক পড়ে—যদি একটু তার জ্বালা কমে। কিন্তু তাও তো হবে না। এ বিষের জ্বালা যে জলে নামলে দ্বিগুণ বাড়ে। দ্বিগুণ নয়—চতুর্গুণ।

ভুজঙ্গ এলো কোত্থেকে খালের জলে?

ভুজঙ্গ নয়, এক কাল-ভুজঙ্গিনী জল থেকে মাথা তুলে বোকা গদাইকে ছোবল মেরেছে! উঃ! কি তার দাঁতের বিষ!

গদাইর মা মরেছে শৈশবে, পিতৃস্নেহ কোনদিনই সে তেমন পায় নি আর পাঁচজনের মত—তাই সে তার কাল্পনিক মৃত্যুকালে মা বাপকে না ডেকে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে সুর করে ডাকল তার রাধাদিদিকে।

‘রাধাদিদি আমায় ধর গো…
সর্ব অঙ্গ জরজর আমায় ধরগো…’

এ সময় গদাইর রাধাদিদিকে মনে পড়ার একটা অকাট্য যুক্তিও ছিল। কারণ রাধা ওকে নিশ্চয় ভালবাসত, নইলে একদিন ওকে একদলা সরভাজা কিছুতেই দিত না। আরও হয়ত অনেক দিন অনেক কিছু রাধা ওকে দিয়েছে—তাই তো আজ মূঢ় কাঁদে…। খালপার যেন সকরুণ হয়ে উঠল ওর অশ্রুজলে।

এক সময় গদাইর কান্না থামল।

গৃহস্থ বাড়ি থেকে দিব্যি টাটকা ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে খাল পার পর্যন্ত ভেসে আসছে। তীব্র উপাদেয় গন্ধ।

কার বৌ এমন মাছ ভাজছে? সরষে বাটা দিয়ে কলাপাতায় মুড়ে, না এমনি কোন মেটে কড়াইতে ছেড়ে? যোগীর মন কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোগের লালসায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ ক্ষুধা সূঁচের ঘায়ের মত যেন একটা জ্বালা ছড়াতে লাগল পেটের কোমল পাকস্থলীর ত্বকে। রাত অনেকটা হয়েছে। খালের এপারে ওপারে শুধু গাছ গুল্ম লতাপাতা। মনুষ্য কণ্ঠ শোনা যায় কি যায় না। মাঝখানের জলও মসী-লিপ্ত। খাল কূল একাকার। কেবলমাত্র ব্যবধান রক্ষা করেছে একফালি নীল আকাশ—সহস্র মণি মুক্তা খচিত যেন একখানা নীল শাড়ি। পোকা মাকড় উড়ছে, উড়ছে নিশাচর দু একটি পাখী।

কিছু চাল নিয়ে গদাই কূলে উঠল। বন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট যে পথটা গেছে একেবেঁকে ঐ মাছ-ভাজুনা বৌদের বাড়ি সেই পথ ধরে সে চলল।

যত এগোতে লাগল ততই তার কানে যেতে লাগল মানুষের কলরব। একটা গোয়াল পড়ল সুমুখে। মস্ত বড় গোয়াল। গরু আছে প্রায় এক কুড়ি। ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ছাড়ছে। টিনের ঘরগুলো নজরে পড়তেই গদাইর মনে পড়ল বাড়ির কথা। মনে পড়ল রাধার কথা। আরও অনেক হারান ব্যথা এসে এক সঙ্গে ঘা মারল তার মনের একতারাটায়।

যাক, এবাড়িতে তার একটা ব্যবস্থা হবেই।

গদাই উঠানে ঢুকে গলার একটা আওয়াজ করতেই চার পাশের আট দশখানা ঘর থেকে বেরিয়ে এল লম্ফ, হুঁকো, ল্যাংটা ছেলে মেয়ে পর্যন্ত। প্রশ্ন হলো বহু রকম। গদাই বিয়ে করেছে, না তার বৌ মরেছে একথাও জিজ্ঞাসা করল কেউ কেউ।

এ বাড়ির সকলেই গান শুনতে যেতে চায় কিন্তু দুঃখের বিষয় গদাইর নাও যে এক মাল্লাই। বোঝাই হয়ে যাবে অল্পতেই।

তবু ঠিক হলো সেই মাছভাজুনী বৌ যাবে, আর যাবে তার বিধবা ননদ কাঞ্চনী, যার মুখে সর্বক্ষণের জন্য যেন লেগে আছে একটা মিহি হাসির রস। সে পাগল করল বৌকে।

'ও আবাগী শুনবিনে কেষ্টলীলা?'

'রাত যে অনেক হয়েছে, যেতে যেতে গান ভেঙে যাবে। আর এতো কেষ্টলীলা নয়, শুনলাম নাকি নিমাই সন্ন্যাস।'

'নিমাই সন্ন্যাস কি মন্দ বৌ? একবার চল গরজ করে। দেখলে আর ভুলতে পারবিনে।' বিধবার সহজাত সহানুভূতি টলটল করে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য, নিরাপরাধ এক গ্রাম্য বালিকা বধূতো সে। মাতৃস্নেহে যার মধুময় মন তার চিত্ত বিগলিত হলো নিমাইর জন্য— মাকে ফেলে গেল কিনা সন্ন্যাসে!

কত কাল আগে কোন দেশের পথ ধরে নিমাই গেছে হরিনাম ছড়িয়ে, আজও এই পল্লীবাসী নরনারীর মনে হয় যেন এ ওদের ঘরোয়া কথা, নিমাই ওদেরই সন্তান; বুনে রেখে গেছে বাংলার আকাশে বাতাসে, তাদের বাড়ির ক্ষেতের পাশে, খালের চরে, বিলের ধারে, এক ব্যথার ফসল। এই ফসলেরই বেসাতি করে বৃন্দা এবং ওর মতই কলঙ্কিনী অনেকে।

কাঞ্চনীর আগ্রহে বৌ তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সারল। গদাইকে খেতে দিল ঘেরা বারান্দায়। গদাই সঙ্গে করে যে চাল এনেছিল তার কথা আর লজ্জায় কিছু বলতে পারল না। কারণ, তাকে এরা স্বজাতির মতই যত্ন করল, মাঝি বলে অবজ্ঞা করল না একটুও।

এই তাড়াতাড়ির মধ্যেও কাঞ্চনী এসে একবারের স্থলে তিনবার ভাজা মাছ নিয়ে যাচাই করে গেল গদাইকে।

'আর লাগবে না ?'

'না, না।'

'তুমি দেখি সাধু।'

গদাই কোন জবাব দিল না।

স্থির হলো কাঞ্চনী ও বৌর সঙ্গে তার এক দেওর যাবে চলনদার হয়ে। বাড়ির আর সকলে যাবে কাল একখানা কাঠামী নাও ভাড়া করে। আহা, এ গান তারা শুনবে না!

সাত

সোজাসোজি গেলে হোগলাগঞ্জের বিল সোঁতাখালের তিন বাঁক জল। ঘুরে গেলে অনেক পথ। খাল আর শেষ হতে চায় না।

কিছুদূর এগিয়ে আসতেই একফালি পাণ্ডুর চাঁদ উঠল আকাশে। ম্লান হলেও জ্যোৎস্নায় অনেকটা পরিষ্কার দেখাতে লাগল চারদিক।

'কোন্ পথ ধরে যাবে ?' কাঞ্চনী জিজ্ঞাসা করল।

'কেন, যাব সোজা এই খালে খালে।' গদাই বলল।

'তবেই হয়েছে। শুনছ না ঝুমের বাজনা—খালে খালে গেলে আর গান থাকতে যাওয়া হবে না। শেষকালে কি যাব আসর কুড়াতে ?'

বৌ বলল, 'আমি তো বলেছিলাম আজ থাক।'

'হ্যাঁ থাকলে আর হয় বুঝি ? গতবার হলো কি ? মেয়ে মানুষের দশ রকম বাধা, নিষেধ চলে পায় পায়।'

মৃদঙ্গ করতাল ও খোলের আবার একটা ঐক্যতান শোনা গেল। এরা একেবারে অস্থির হয়ে উঠল। তবে ঐ অস্থিরতার ভিতর ক্রমে ক্রমে যেন বিরক্তি প্রকাশ পেতে লাগল বৌর। এত জ্বালা করে আসা হলো, আবার যদি গানও ভেঙে যায়।

'কি গো সাক্ষী গোপাল, কিছু যে বলছ না। যাবে কোন্ খালে ?'

দেওরটি জবাব দিল, 'আমি তো চলনদার। আমি কি জানি,—বেশি গোলমাল দেখলে, উঠে সোজা হাঁটা ধরব। এই সিধে তো একতলই একখান মাঠ মাঝখানে।'

'তা হলে আমি কি করব ? তোমরাও উঠে এসো—এই তো রশি দুয়েক পথ।'

মাছ ভাজুনী বৌ শাড়ি গুছিয়ে জলে নামল। সামান্য জল, পিচ্ছিল কাদা, টাল রাখা দায়। 'ওকি তুমি যাবে না ঠাকুরঝি ?'

'আসার সময় দেখি হাতে পায় ধরে আনলাম—এখন একেবারে তপ্ত গরজ ! এটা যে তোর মামাশ্বশুর বাড়ির দেশ, কেউ দেখলে বলবে কি ! শাড়ি ছেড়ে, পা ধুয়ে, নায়ে ওঠ।'

পরশুরাম চলে গেছে, নায়ে বসে আছে ঠাকুরঝি ঠাৈরেন আর লজ্জিতা ভীতা ও ব্যথিতা এক গ্রাম্য বধূ।

গান শেষ হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুর চাঁদও ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। জোয়ারের অনেক দেরি। গদাই প্রাণপণে ঠেলতে লাগল নাও। কি দায়িত্বে পড়ল সে—হয়ত নিমাইর সঙ্গে দেখা হবে না। আসর ভাঙা মাত্রই বিদায় হতে পারে দল। একরাত না পাঁচ রাতের বায়না, তা তো সঠিক কেউ জানে না।

ঘাট মত যাওয়ার জন্য গদাই একেবারে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। আর তার শক্তিতে কুলায় না। মাঝে মাঝে নাও ছেড়ে সে হাঁপাচ্ছে।

আর একটুক এগিয়ে যেতে পারলেই আসর। নিশ্চয় সৌদামিনী আজও সেজেছে নিমাই। কাল গদাই কিছুই জানত না, আজ সবই সে জানে, তাই নাও ঠেলে চলে প্রাণপণে শুকনা খালের বুক চিরে।

কিন্তু এ যেন তাল গাছের আড়াই হাত। সব খানি পথ এসে এখন তার শক্তি হলো নিঃশেষ !

'ঠাকুর ঝি ঠাইরান, একটা কথা বলব ?'

'কি কথা ?'

'একটু নেমে চলেন না, নাও হাল্কা হক।'

'আয় আয় বৌ, ঐ তো ঘাট রয়েছে খেজুর গাছের—নতুন দিব্যি ঘাট। আমরা পা ধুয়ে কূলে উঠি।'

মাছভাজুনী বৌ বলল, অবশ্য ফিসফিস করে, 'এখন দেখি বড় মায়া, এটা মামাশ্বশুর বাড়ি নয়, আমার ?'

'মিছামিছি কথা বাড়াসনে, নেমে আয়। তোর লাজ সরমের এখন দায়িত্ব আমার।'

ছুজনেই খালে নেমে কূলে উঠলো। বৌ কথায় কাতর নয়—ফের বলল, 'আর তোর লাজ সরমের দায়িত্ব বুঝি ওনার?'

'বেশ। আমি বৌ মানুষ, যাব তোমরা থাকতে মাঝিকে পথ দেখাতে?'

'তুমি তো বৌ নয়, বৌর স্বোয়ামী।'

গদাই ভাবল, এরা যে যা বলুক এখন বাইতে পারলেই যেন পথ ফুরাত। গানের জন্য অন্যের চাইতে ওর আগ্রহ তো একটুও কম নয়।

'তোমরা কোথায় যাবে—গান শুনতে যদি যাও এই পথে এসো—আমার লায়ের সাথে সাথে।' একখানা ছোট্ট ডোঙা এগিয়ে গেল।

গদাইও তার পিছন পিছন টান দিল।

একটু পরেই ছুখানা নাও সোঁতা-খালে এসে ঢুকল। ছোট ডোঙাখানা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারছে। গদাইর ডিঙিখানা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না—কারণ খালের পরিসর যেমন অল্প, তেমনি বাঁকগুলিও ঘন ঘন। ছুপারে তাল তেঁতুল সুপারি গাছের নিবিড় জঙ্গল।

গদাই দেওরটিকে একখানা বৈঠা নিয়ে নায়ের এক প্রান্তে যেতে বলল একটু ঠেলা ঠোক্কর বাঁচাতে। দেওরটি তার কথা মত উঠল। কারণ আবার বাজনা বাজছে—বাজছে মৃদঙ্গ মন্দিরা এক সঙ্গে। গান বুঝি শেষ হয় হয়। ছু প্রান্তের ছুজনে যথাশক্তি টানতে লাগল নাও। শুনতে লাগল জলজঙ্গলের ওপর দিয়ে ভেসে আসা মধুর বাদ্য, মাঝে মাঝে সংগীতের মূর্চ্ছনা, বুঝি বা নিমাইর অপূর্ব কণ্ঠ।

বৌটি জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি গানের নাগাল পাব ঠাকুরঝি?'

গদাই উদ্দেশ্যটা বুঝে ঠাকুরঝিকেই উপলক্ষ্য করে জবাব দিল, 'নিচ্চয় বুইন দিদি।'

খানিকবাদে গদাই আবার বলল, 'বেশি দূর নয় ঠাকুরঝি ঠারৈন, ঝুমুর শুনে বোঝেন না।'

কাঞ্চনাকে একটা চিমটি দিল বৌটি—'ঠাকুরঝি ঠারৈন!'

'আঃ বিরক্ত করিসনে বৌ।'

'কি দেখছিস?'

অন্ধকারে কিবা দেখা যায়। তবু মাঝে মাঝে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আভাসে বোঝা যায় তার সুমুখে এক জাতির এক গোত্রের এক বলিষ্ঠ যুবক বৈঠা ফেলছে। আগে কাঞ্চনী যা লক্ষ্য করেনি, এখন সে তা ভাল করে দেখছে। মানুষ নয় শুধু গদাই, একটা শক্তি ও উৎসাহের উৎস। রূপের প্রশ্ন এখন এখানে অবান্তর। কাঞ্চনী তার চঞ্চলতা হারিয়ে হঠাৎ কেন জানি কেমন হয়ে রইল। গান যদি না-ও গিয়ে শোনা যায়, আসর যদি যায় ভেঙে, তবু এভাবে এগিয়ে চলা মন্দ নয়—অস্পষ্ট বনে জঙ্গলে স্রোতের মুখে।

নৌকা যত এগুতে লাগল, দূরের আসরের আলো ও ঝংকার যত স্পষ্ট হতে লাগল, দেওর পরশুরাম ততই জোরে জোরে বৈঠা টানতে লাগল। মাছ-ভাজুনী বৌর বুকের ভিতরটা এখন বেশ দুরু দুরু করছে। ভগবান ওরা যেতে যেতে গান যেন না শেষ হয়! বিধবা ননদ কাঞ্চনী শুধু কিছু ব্যক্ত করছে না।

ভাগ্যের এমন ভোগ নৌকা হঠাৎ চরায় ঠেকল। ভাটায় খালের জল কমে গেছে, সুমুখের ডোঙাখানা কোন রকমে লগি মেরে এগিয়ে গেল, কিন্তু আটকে রইল গদাইর ডিঙি। পরশুরাম কি যেন বলে সোজা হাঁটা ধরল খালের কাদা চর ভেঙে।

মাছভাজুনী বৌ বিব্রত হয়ে বলল, 'তুমি তো ভাল চলনদার,—কার কাছে ফেলে যাচ্ছ আমাদের?'

কাঞ্চনী বাজে কথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'শুনছিস, কেমন মিঠে গলা।'

'কিন্তু গান যে শেষ হয়ে গেল ঠাকুরঝি!'

রাই কানু, দুহুঁ তনু মিলন হলো রে
শ্যামের গলে দিচ্ছে মালা অতি যতনে।...

তারপর শোনা গেল প্রেমধ্বনি—উঠল সভা সমেত লোক হরি আনন্দে হরি হরি বলে। গান আজও জমেছিল খুব। তবে

শ্রোতাদের মধ্যে যারা সেদিন বারচালার গান শুনেছিল তারা বলল যে সেখানেই গান জমেছিল এর চাইতেও অনেক বেশি। মেয়ে গাইনের গুণেই সভা মজে। সৌদামিনী তো আজ আর নিমাই সাজেনি।

গদাই নাও রেখে ওপরে উঠে শুনল সব। সৌদামিনী ফুরণে গায়, ফুরণ ফুরালে যেদিকে ইচ্ছা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে একদলে বেশি দিন ধরে রাখা দায়।

এবার গদাইর মনে হতে লাগল সত্যই সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। গা হাত পা তার টনটন করছে ব্যথায়। পরিত্যক্ত আসরের আলোগুলো নিবিয়ে দিলেই যেন ভাল হয়। আর কেন মিছে রোশনাই!

গদাই তবু এগিয়ে গেল দোহার বাইনদের কাছে। কেমন বাধা এবং সংকোচ এলো রাধার কথা জিজ্ঞাসা করে জানতে।

'আপনারা তো আন্দাজ করেও একটা বলতে পারেন।'

একজন বাইন মৃদঙ্গটায় লাল সালুর ঢাকনি পরাতে পরাতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি জানতে চাও?'

'রাধাদিদির খবর।'

'রাধা কে, মহেশ্বর?'

'সৌদামিনী গাইনের এক নাম রাধা। তোমরা শুধু শুধুই গানের দলে আছ, কোন খবর-পত্তর তো রাখবে না। ছোট কালে নাকি ভাব ছিল এক গাধার সাথে—বুদ্ধির কলি ফুটতে না ফুটতে বেরিয়ে আসে গাঁজাখোর গোলকা নাপিতের সঙ্গে। তারপর থেকে একা একা রংগে আছেন। থাকেন একা এক বৈঠার ডিঙিতে। দিনে কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ পূজা—রাত্রে হয় রাসলীলা। ভাই, বৃন্দার দলে এত আদর যত্নেও টিকল না, আমরা তো ছার!...তা ভাই, তুমি তাকে খুঁজছ কেন বলো তো?'

'আমার এক দেশি মেয়ে—এই এবাড়ি-ওবাড়ি।'

'তোমার নাম?'

'গদাই।'

সকলে শুনল যেন গাধাই—এগিয়ে এলো মৃদঙ্গ ঢোল খোল করতাল থুয়ে। পাঁচ সাত জোড়া চোখ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে।

'নাঃ, মানুষ!' অস্ফুট স্বরে কে মন্তব্য করল যেন।

'তোমার দরকার?' অধিকারী প্রশ্ন করল।

একজন বলল, 'কণ্ঠীবদল করবে।'

গদাই সবই বুঝল; অন্য কোনদিন হলে হয়ত ত্রিশ যেত। আজ সে সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে জেনে নিল ঠিকানা। অনেক মর্মঘাতী হাস্য ও ব্যঙ্গরসের রং তার বুকে ও মুখে কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করে তাকে স নিতে হল।

তবে যার সন্ধান সে শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করল সে তো তার রাধাদিদি নয়—এক পরম ব্যভিচারিণী মেয়ে মানুষ নাকি। থাকে নায়ে নায়ে, কোথা থেকে কোথায় যায় তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। হয়ত নানা গঞ্জে ঘুরলে এক বন্দরে দেখা হবে।

গদাই নায়ে ফিরে এলো।

যাত্রী তিনটি চুপ করে বসে আছে। জোয়ার এসেছে—নাও ভাসল।

গদাই ওদের বাড়ির ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। 'এখন যাই ঠাকুরঝি ঠাৈরেন।'

'বলে দাও ঠাকুরপো, আবার এই পথে এলে যেন দেখা হয়।' বৌটি বলল, পরশুরামের আর কিছু বলা লাগল না। গদাই জবাব দিল, 'এ আর বলতে ঠাকুরঝি ঠাৈরেন!'

ভোর প্রায় হয় হয়। আকাশে হিংগুল ভেঙে দিয়েছে। একবার কি যেন ফিরে দেখল কাঞ্চনী। আকাশ, খাল পারের হোগলা হেউলীর ছোপা, না—অন্য কিছু বোঝা গেল না। ওরা এখন কূলে, গদাই চলে গেছে অনেক দূরে।

'কি দেখলি ঠাকুর ঝি?' জিজ্ঞাসা করল মাছভাজুনী বৌ।

কাঞ্চনী লক্ষ্য করল, ব্যস্তবাগীশ পরশুরাম এগিয়ে গেছে বাড়ির দিকে। সে মাছ-ভাজুনী বৌর গলা জড়িয়ে ধরে নিম্ন কণ্ঠে গাইল—

নায়ের নেয়ে, পুরুষ কি মেয়ে
একবার মাত্র দেখেছিলাম···

খালপারের আবহাওয়া হঠাৎ যেন মেদুর হয়ে উঠল কাঞ্চনীর গানে।

আট

ঘুরতে ঘুরতে গদাইর প্রায় তিন চারটা মাস গত হল।

কত ঘাটে যে সে নাও ভিড়াল, কত গাঁয়ে যে রাত কাটাল তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে একটা সংবাদ সঠিক বলেই তার কাছে এল।

সৌদামিনী নাকি সত্যই চরিত্রহীনা, থাকে এখানে ওখানে। কখন-সখন ফুরণ গায়, নইলে দিন কাটায় সহর বা বন্দরের বাবুদের মন মজিয়ে।

কিছুতেই সৌদামিনীর চরিত্র অত জঘন্য হতে পারে না। না, না, কিছুতেই নয়! তবু একটা ব্যথা বিষের শূলের মত বিঁধতে লাগল গদাইর বুকে। অবিশ্বাসের মধ্যেও একটা দুর্বল সন্দেহ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। সে মানতে রাজি নয়, তবু আষাঢ়ের বাত্যাতাড়িত মেঘের মত এক একবার জমতে লাগল জ্বালা।

অনেক গঞ্জ, অনেক বন্দর খুঁজল গদাই; কিন্তু দেখা পেল না সৌদামিনীর। কেউ বলে, 'এই তো ছিল কোথায় যেন গেল—দেখ দেখ একটু ওপারে মহাজন মহল্লায়।'

গদাই সত্যই হতাশ হয়ে পড়ল। আর কত ছুটে বেড়ান যায়। অবশেষে সে 'পারা গাঁথল' (লগি পুঁতল) এক হাটে। রান্না করল, খেতে বসবে, এমন সময় সংবাদ শুনল—খালের এক বাঁক ভাটিতে কীর্তন হবে। সে যাকে খোঁজে, যার জন্য দিন কি রাতের হিসেব না করে নাও বায় খালে-খালে, গাঙে-গাঙে, তারই মত একটি নাকি সুন্দরী মেয়ে মানুষ আছে ঐ দলে।

'নাম?'

'জানিনে। আমাকে একটু পার করে দাও ওপার, নায়ে তোল, তারপর বলছি সব তোমাকে।'

'তুমি কি জাতি ?'

'মুসলমান।'

চিন্তায় পড়ল গদাই। নায়ের পাটাতনে সদ্য রান্না ভাত ও ব্যঞ্জন। 'একটু দেরি করতে পার ভাই, আমি চারটি খেয়ে নিই।'

'নেও, কিন্তু আমার মার অসুখ। জায়গীর থেকে পড়ি সুনামগঞ্জ—যাব আম্মাকে দেখতে।' একটু ক্ষুণ্ণ মনে উত্তর দিল পারের বালক।

'তোমরা এত ঘেন্না কর আমাদের!'

কথার ভিতর নালিশ নেই, শুধু আছে ক্ষোভ।

গদাইর প্রাণে ঘা লাগল খুবই। গদাই চেয়ে দেখল, বালক যেন বালক নয়—বাল-গোপাল। হয়ত ছলনা করতে এসেছে গদাইকে। ও ঠকবে না। প্রভু কাজীকেও প্রেম বিলিয়েছে, ও পার করে দেবে মুসলমানরূপী এই নারায়ণকে।

'এসো ভাই, এসো।'

'নায়ে যে ভাত।'

'তাতে জাত যাবে না আমার।' তারপর মনে মনে বলল, 'এত চাতুরীও জান, এত ছলনাও শিখেছে নারায়ণ।' গদাই বালকের হাত ধরে নায়ে তুলল, গামছা ভিজিয়ে পা ধুইয়ে দিতে গেল, কিন্তু আপত্তি করল বালক। গদাই সে আপত্তি আজ শুনতে চায় না। রাধাকৃষ্ণ ও নদীয়ার নিমাইর প্রেমে তার মন মাতোয়ারা। সে ঐ সুকুমার ছেলেটিকে বাল-গোপালের মত কোলে করে তার পায়ের কাদা ধুইয়ে দিয়ে তবে শান্ত হলো।

'এ করলে কি মাঝি ভাই? পায় হাত দিলে?'

হিন্দু মাঝি কিছুতেই মুসলমান যাত্রীর পা ধোয়াতে পারে না—বিশেষ করে যে যাত্রীর কাছে পয়সার কোনও আশা নেই। তবু গদাই সমস্ত ক্লেদ পঙ্ক নির্মল করে দিল প্রেম ও মাধুর্যে। রাধার ধ্যানে, রাধার জ্ঞানে অমিয় জমেছে ওর মনে।

'ভাইটি তুমি যাবে কোথায় ?'

'ওপার।'

গদাই একটু হাসল। সে কাকে ওপার পার করে দিচ্ছে ? এ তো রীতিমত রহস্য। 'ওপার যাচ্ছ কেন ?'

'এই যে বললাম আম্মার (মায়ের) অসুখ।'

ও তো আম্মা নয়, মা যশোদা। তার কি কখনও রোগ হতে পারে ! চায় বাল-গোপালকে বুকে করে রাখতে। 'তুমি কতদিন ধরে পালিয়ে এসেছ ?'

'পালাব কেন ? পড়তে গিয়েছিলাম। এই দেখ না আমার খাতা কেতাব।' বালক খাতা খুলে কালির অক্ষর দেখাল। বই কখানা খুলে ধরল নিরক্ষর গদাইর সুমুখে।

মাথায় তুর্কি টুপি, পরনে কোর্তা পায়জামা—একি সাজ শ্রীহরির ! তবু ধরা যায় নবঘনশ্যাম বরণ। বালক ফর্সাও নয়, কালোও নয়, অথচ আলো করে বসে রয়েছে গদাইর নাও। ও রূপ তো লুকাবার নয়। কতবার কত ভাবে ছলনা করেছে কিন্তু গোপীরা তো ঠিক ধরে ফেলেছে। কালির অক্ষর। কি লিখেছ প্রেমময় ? কাকে ঠকাতে চাও ? মা যশোদাকে, না গোপনারীদের, না এই মূঢ় গদাইকে ?

অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে গদাইর, জানাতে ইচ্ছা করে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত ব্যথা—? এত ব্যথা দিয়ে তুমি কি আনন্দ পাও নারায়ণ কিন্তু নাও ঠেকে এসে এপার।

'তবে উঠি মাঝি ভাই।' বালক নেমে যায়। গদাই কিছু বলতে পারে না। বালক আবার ফিরে এসে বলল, 'পয়সা নেবে না ?'

'হ্যাঁ তোমার কাছ থেকেই তো রাখব পয়সা ! যাও, যাও।'

বালক ওপারের কলা বাগের অন্তরালে অদৃশ্য হওয়া মাত্র গদাইর মন হুহু করে উঠল। হায়রে সে কাকে বিদায় দিল। সে সব বুঝেও কিছু যেন বুঝল না !

জিজ্ঞাসা করেও তো রাখা হলো না রাধার কথা। ভুল, ভুল এত ভুলও সে করল !

গদাই নাও ভিড়িয়ে ভাত খেল। আজ মনে হলো সে যেন প্রভুর স্পর্শ করা মহাপ্রসাদ পেল। অমৃতের মত লাগল সাধারণ বালাম চালের ভাত এবং নুন-কটা তরকারী।

খেয়ে দেয়ে নাও ছাড়ল গদাই। জায়গা মত গিয়ে যার সঙ্গে দেখা হলো সে বৃন্দা। নিরাশ হলেও একটা উচ্ছ্বাস এলো গদায়ের মনে। বৃন্দা অনেকটা শুকিয়ে গেছে। 'এমন হলো কি করে দিদি? তোমার অমন রূপে কে দিয়েছে কালি মেড়ে?'

'আর বলিস কেন গদাই, টিয়া পুষলাম—দুধ ছাতু খাওয়ালাম; উড়তে শেখা মাত্র পালিয়ে গেল ফুড়ুৎ করে উড়ে।'...বৃন্দা একটা ভাঙা বাক্সে কাপড় চোপড়, শাড়ি উত্তরীয় গুছিয়ে রাখছিল, সেগুলো যেমন ছেঁড়া তেমনি মলিন, বলল, 'আমি সেধে আনিনি, এসেছিল ইচ্ছে করে গোলকের সাথে। যাক সে সব কথা, তুই কেমন আছিস, আজকাল করিস কি? দেখা হয়ে সুখী হলাম। তোর দেখি বেশ টান আছে বৃন্দাদিদির জন্য। অথচ তোর বাড়িও একই গাঁয়ে। এখন করা হয় কি?'

'নাও বাই।'

'ভালই তো, আমার সাথে থাকবি?'

গদাই নীরবে সম্মতি জানাল।

'প্রাণে টান না থাকলে কি কেউ আসে এক বাঁক জল ভাটিয়ে দেখা করতে? রাধার কথা আর বলিসনে—ওর নাম আমার আর মুখে আনতে ইচ্ছা করে না।'

কিন্তু যতক্ষণ গদাই না উঠল ততক্ষণ ধরে বৃন্দা শুধু নিন্দাই করল রাধার। কেন তার নাম করা দলের আজ একখানা ভাল শাড়ি নেই, বাইন নেই, গাইন নেই, নেই ওস্তাদ—তার হেতু নাকি শুধু ঐ হতভাগী রাধা। বোনের মত ভালবেসে বড় দাগা পেয়েছে বৃন্দা।

'এখন কোথায় আছে রাধাদিদি?'

'ওরে তুই তো জানিস নে, ও আজকাল নাকি ঝুমুর গায়,—ঝুমুর গাইয়ে মেয়ে মানুষ বেশ্যারও অধম।'

'কেন একথা বলছ তুমি? স্বভাব যদি পরিষ্কার থাকে…'

'তা কক্ষনো থাকতে পারে না গদাই। যাদের চাল চুলো নেই, না পাওয়া যায় একটা ঠিক ঠিকানা, না আছে যার কোনও মা বোন ভাই বেরাদার, তার স্বভাব ঠিক রাখবে কে? বয়সের ধর্ম—আগুনের কাছে ঘি, তোর কাছে আর বলব কি, তুই ছোট ভাইর মত।'

'তা যা বলেছ বিন্দেদিদি, আগুনের পাশে ঘি—যাক গে, আমি তোমার সাথেই থাকব, আর পারিনে এভাবে ভাসতে।' গদাইরও মনটা কেমন যেন বিরূপ হয়ে উঠল সৌদামিনীর ওপর।

নয়

সৌদামিনী চলে যাওয়ার পর থেকে বৃন্দার ওপর দিয়ে অনেক ঝাপটা গেছে। সেবার বর্ষাকালের অভাবের ঝাপটাটা যে ভাবে সামলাবে ভেবেছিল বৃন্দা, তা পারেনি সৌদামিনীর দরুন। নাও থেকে উঠে কোথায় উধাও হয়ে গেল সেই আঁধার রাত্রে, তার আর তখন হদিস করতে পারেনি বৃন্দা। তারপর থেকে সে আর তেমন করে সাজাতে পারেনি দল। একা একা খেটেছে অনেক খাটুনি, কিন্তু আশা ও প্রয়োজন মত্ অর্থ সংগ্রহ হয়নি। তবু সে ব্যবসা ছাড়েনি। মাতাল যেমন অনেকবার নালা নর্দমায় পড়ে গিয়ে চোট খেয়েও আবার মদ দেখলে এগিয়ে যায় তেমনি একটা নেশার টানে বৃন্দাও যেন চলেছে এগিয়ে। লোক-নিন্দা, গ্লানি, দেহের ক্ষয় ক্ষতি কোন দিকে তার দৃকপাত নেই। সে চায় দল গড়তে—হরিনামের শ্রেষ্ঠ দল। বৃন্দা পুরুষ নয়, কিন্তু ওর প্রকৃতিতে অনেকখানি, প্রায় পনের আনী খাদ ছিল পুরুষের। ভেঙেছে অনেকবার দল, তবুও গড়েছে বারংবার। ও কোন বাধা বিপত্তিই গ্রাহ্য করতে রাজি নয়। ভাল ও কাউকে কোনদিন বাসেনি, কেউ কোনদিন যে ওকে বাস্তবিকই ভাল বেসেছে সে অপবাদও শোনা যায় না। শুধু ওর অভিলাষ, ও ভাগ্য নিয়ন্তা হবে এক শ্রেষ্ঠ সুকুমার কাব্য ও প্রেম-সংগীতের দলের—বাংলার গ্রাম্য চির মধুময় ঢপ কীর্তনের দলের। প্রেম নেই তবু অহমিকা আছে প্রেম বিতরণের! মধু নেই তবু অহমিকা মধু বণ্টনের!

সত্যই কি বৃন্দা প্রেমহীনা? সে কি ভাল বাসতে জানে না? আদি রস ও মধুর বিরহ-মিলনের স্রোতের ভিতর দিয়ে যে আশৈশব সাঁতার কেটে চলেছে তার দেহ কি একটুও সিক্ত হয়নি কোন দিন?

কেউ জানে না যে বৃন্দা তার পিতার মৃত্যুর ঠিক পরেই কেমন করে চোট খেয়েছে এক ওস্তাদ কীর্তন গায়কের হাতে। তখন সে-ই ছিল দলের নায়ক। বয়স ছিল তার চল্লিশের কাছাকাছি, নাম ছিল দয়াল। তার সঙ্গে প্রভু কথাটা যোগ করে দিয়েছিল গানের দলের প্রসাদলোভী যারা। দয়াল ছিল সংযমের দুর্গ এবং চিরকুমার। বৃন্দার পিতা মৃত্যুকালে সেই দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে যুবতী কন্যাকে রেখে অন্তিম নিশ্বাস ছাড়ল।

দয়াল প্রভু বলল, 'বৃন্দা, তোমার ভয় নেই।'

স্নেহাকাঙ্ক্ষী একটি কুলায় প্রত্যাশী পাখির মত বৃন্দা এগিয়ে এলো।

'তোমার বাপের দল আমি থাকতে যাবে না।'

এই তো বৃন্দা চায়। একটি বলিষ্ঠ আশ্রয়।

'তোমার পিতা ছিলেন মহা পুণ্যবান—কত দেশদেশান্তর ঘুরে যে তিনি নাম বিলিয়েছেন এই ঢপ কীর্তনের দল মারফত! আমি সব জানি বৃন্দা, জানে অনেক গঞ্জের ভক্ত মহাজনেরা।'

পিতার কীর্তি, পিতার খ্যাতি, শুনলে বুক জুড়ায়। বৃন্দা অভিভূত হয়ে পড়ে।

সে দয়াল প্রভুকে যত দূর সম্ভব যত্ন আদর ও সেবা করতে থাকে।

বৃন্দার পিতা দয়ালকে দল চালাবার সমস্ত ক্ষমতা দিলেও হাতে রেখেছিল রশি। কিন্তু বৃন্দা দিল রশিতে ঢিল। অভিজ্ঞতার অভাবই এর মুখ্য কারণ—গৌণ একটা হেতু ছিল, তা ওর বয়সের দোষ।

একবার বর্ষাকালে দল ভেঙে দিয়ে দয়াল আর অন্যত্র গেল না। বলল, 'তীর্থে চলো বৃন্দা।'

'কোথায়, কোন্ তীর্থে?'

'তীর্থের আবার অভাব ভারতবর্ষে।'

'কিন্তু…'

'দ্বিধা করে লাভ কি? এ ক'টা মাস তুমি কাটাবে কোথায়? থাকত বন্ধু, রইতে না হয় নায়ে। তার চেয়ে চলো বৃন্দাবন। সোনার তালগাছ দেখবে ভক্ত জগৎ শেঠের।'

'সোনার তালগাছ! এত সোনা পেল কোত্থেকে! মিথ্যা কথা।'

নৌকার মাঝিরা দুজনে পর্যন্ত বলে উঠল, 'না, না। সেবার বৃন্দাবনে গিয়ে আমরাও দেখে এসেছি—কি ভক্তি, আহা-হা অতখানি খয়রাত করেছে সোনা।'

'এখন শুনলে তো, এবার বিশ্বেস হলো?'

'জগৎ শেঠ কে?'

'একজন পরম বৈষ্ণব ধনী,—মহারাজের দৌলতও তার কাছে কিছুই নয়।'

'এত সোনা পেল কি করে?'

'একান্ত মনে সাধনা করে। ডাকার মততো ডাকা চাই।'

মাঝিরা বলল, 'যা বলেছেন প্রভু। জগতে শেঠ হওয়া যার তার কম্ম নয়।'

বৃন্দা এরপর আর ইতস্তত না করে চলল বৃন্দাবন। দেখল নবঘন শ্যাম নারায়ণের হাজার মূর্তি। কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগল তার কাছে শেঠের সোনার তালগাছ। ভক্তি যেন একেবারে জ্বলজ্বল করছে।

বছর দুয়েক এইভাবেই কাটল। দল বর্ষাকালে ভাঙছে আবার নিয়ম মত গড়ছে আশ্বিনের প্রথম। চলছে সব কিছু যেমন চলা উচিত।

কেবল বদলে গেল দয়াল প্রভুর রূপ। টিকি তার সহসা উধাও হলো, টাকে পড়ল কবিরাজী তেল। কাপড় চোপড়েরও তার ভোল বদলাল অনেক। গেরুয়া আবরণের স্থান দখল করল মিহি জামা চিকণ ধুতি।

কেউ কেউ সিদ্ধির পাত্রটা সুমুখে এগিয়ে দিয়ে, সময় বুঝে প্রশ্ন করল, 'এসব কি প্রভু?'

'প্রশ্রয় মার্গের সাধনা। ধ্যান ধারণা না জন্মালে শুধু শুধু জিজ্ঞেস করবি নে। বয়েস হক, তখন বুঝবি।' একটা তাচ্ছিল্যভাব ফুটে ওঠে দয়ালের মুখে। প্রসাদলোভীরা ভয়ে ও ভক্তিতে তটস্থ হয়ে থাকে।

একদিন হরিৎগঞ্জের এক আসরে গান আরম্ভ হলো সন্ধ্যার অনেক আগেই। গান ভাঙল প্রথম রাত্রে—থানার ঘড়িতে তখনও দশটা বাজেনি, মেইল ষ্টীমার তখনও তার সন্ধানী আলো ফেলে আসেনি গঞ্জে। খেয়ে দেয়ে নায়ে এসে যে যার জায়গা মত শুয়ে পড়ল। সেদিন হয়েছিল নৌকা-বিলাস পালা। দয়াল প্রভু জোর এবং অনেকটা জিদ করেই সেজেছিল কৃষ্ণ। রাধিকা সাজে যে মেয়েটি তার এলো কম্প জ্বর। বাধ্য হয়ে বৃন্দাকেই সাজতে হলো রাধা।

দয়ালকে দেখে বৃন্দার ভাব আসে না, আসর জমছে না কিছুতেই। লোকে হৈ চৈ করে উঠল। তখন নিরুপায় হয়ে বৃন্দা একপাত্র দেশী মদ খেয়ে একটা কড়া দোক্তার পান খেল। বিড়ি ফুঁকল গোটা দুয়েক।

ব্যস, আসরে ঢোকা মাত্র গান জমল,—গলা খুলে গেল যেমন খোলা প্রয়োজন। দয়াল সুযোগ পেলেই রাধিকাকে জড়িয়ে ধরছে, গান গাইছে ভাবে বিভোর হয়ে। জীবনের খাতার পাতায় কৃষ্ণ সাজার অধিকার তার হরণ করেছে বয়স। তবু সে যখন জোর করে আসরে নেমেছে তখন তার সমগ্র শক্তি ও আকুলতা দিয়ে রাধাকে মুগ্ধ করতে চায়। এ তার অভিনয় নয়, এ তার হারিয়ে যাওয়া জীবনের সঙ্গে সত্যিকারের শেষের পরিচয়।

নেশা করলেও বৃন্দা বিরক্ত হচ্ছিল। সে তো ষোল আনা বেহুঁশ হওয়ার মত মেয়ে নয়। দয়ালের সংযম ক্রমে যেন শিথিল হচ্ছে। কিন্তু ঐ ভাবপ্রবণ শৈথিল্যেই জমিয়ে ফেলল আসর। যত পালা শেষ হয়ে আসে ততই আসরভরা মানুষ ঔৎসুক্য ও ব্যাকুলতায় অধীর হয়ে ঘটনার পরিণতির জন্য অপেক্ষা করে।

বয়সের দীনতা ঘুচে গেছে দয়ালের। নেমেছে প্রেমের বন্যা—সন্ন্যাসীর অহংকারের বাঁধ ভেঙে এসেছে বাস্তবের ভোগ লালসা ও দুঃখ বেদনার জোয়ার। শুধু একটি দিন এলো তার জীবনে যখন সত্যই সে বিরহী কৃষ্ণ এবং তার সুমুখে তপ্ত যৌবনা শ্রীরাধা। সে আকুল হয়ে কেন আলিঙ্গন করতে চাইবে না বৃন্দাকে?

গান শেষ হলো, সকলেই বলল, 'চমৎকার, মধুর—মধুর হয়েছে অভিনয়।'

কিন্তু একটা কী যেন ব্যথা নিয়ে দয়াল ফিরল নায়ে। সকলে শুয়েছে, ও খায়নি, বৃন্দা এলো খোঁজে।

দয়াল তখনও ধরা চূড়া ছাড়েনি। অন্ধকারে শুয়ে আছে।

'খাবে না?'

'ইচ্ছা নেই।'

'কেন?'

'সব কথা সব সময় বলা যায় না।'

'ঢং করলে আমি চললাম, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

'তুমি আমার একটা কথা রাখবে।' দয়াল এগিয়ে এসে যেমন করে দয়িতার হাত দুখানা চেপে ধরে তেমনি করেই সাগ্রহে ধরল বৃন্দার হাত।

বৃন্দা কিছুদিন ধরেই সব লক্ষ্য করছিল, আজ দয়াল চরমে পৌঁচেছে—সে অত্যন্ত উগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কি কথা?'

মেইল ষ্টীমারের শাণিত আলো এসে পড়ল নদীর পূবের বাঁকে। ক্রমে ঘুরল আলো। চকচক করে উঠল সুপ্ত গাঙ, স্টীমার ঘাটের যাত্রীরা কেবল ঘুমায়নি—দূরে তাদের কোলাহল শোনা গেল।

'তোমার বাপের আমলের লোক আমি—'

'তাতে হয়েছে কি!' বৃন্দার মাথায়ও একটা তীব্র নেশার রেশ তালগোল পাকাচ্ছে।

'আমি তোমাকে নিষেধ করি, আর তুমি মদ খেও না।'

'তুমিও তা হলে আর কৃষ্ণ সেজো না।'

বৃন্দা উঠে গেল—সন্ধানী আলোকে দেখে গেল দয়ালের চোখে জল। কিন্তু কেন আজ দয়াল কাঁদছে, কোন্ গভীর ক্ষতে তার আঘাত লেগেছে, তা বৃন্দা তখন তলিয়ে দেখল না।

ভোর রাত্রে আর একখানা স্টীমার যায় পশ্চিমে। ঘুম থেকে উঠে সবাই দেখল দয়াল প্রভু নেই। কুলিদের মুখে শোনা গেল, সে নাকি আবার গেরুয়া বাস পরে যাত্রা করেছে পশ্চিমে—হয়ত জীবন-সীমান্তের শেষ কোনও গঞ্জের দিকে।

সংবাদ শুনে বৃন্দা স্তব্ধ হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার চোখেও দেখা গেল দু ফোঁটা জল।

দয়াল প্রভু চলে যাওয়া মাত্র দলে লাগল ভাঙন। বাকি বকেয়া পাওনার জন্য সকলে অস্থির করে তুলল বৃন্দাকে। তহবিলে নেই এক পয়সা অথচ তাগাদা প্রায় হাজার টাকার। এ সব কি করে যে মীমাংসা করা যায়—এক টাকা দিয়ে কি করে যে তিন টাকার প্রলোভন দেখিয়ে সত্য মিথ্যা অনেক কিছু বলে দল খাড়া রাখতে হয় তা বৃন্দা জানে না। ওর সরল কথায় সকলেই টের পেল আর্থিক দুর্বলতা। প্রথম দুটি সুন্দর গাইয়ে ছেলে গেল দল ছেড়ে। তাদের মা এসে বেড়াবার নাম করে এ দল থেকে নিয়ে অন্য দলে ভর্তি করে দিল। তারপর গেল মালিনী গাইন। তারপর ধীরে ধীরে সকলে। বৃন্দা কি যে বলবে, কি যে করবে, স্থির করার আগেই যেন ভাঙল রাজসভা, নিভল প্রদীপ। পড়ে রইল শূন্য কখানা নাও।

কেবল গেল না একটি লোক—সে অন্ধ দোঁহার।

'তুমি যে বড় রইলে সাধু?'

'তোমাকে কে দেখবে, মাল-পত্তরই বা পাহারা দেবে কে? ঠাকুর ভাই বেঁচে থাকতে সেই সনে ঠিক এমনি হয়েছিল; শুধু আমি যাইনি।'

অন্ধ দেবে পাহারা, মন্দ নয়! বৃন্দার বুকটা তোলপাড় করে উঠল নায়ের দিকে চেয়ে। পিতার মৃত্যুর অভাবটা এইবার যেন সঠিক ভাবে এতদিন বাদে উপলব্ধি করল বৃন্দা। আপসোস হলো

দয়ালের জন্য। সে যে এ দলের কি এবং কতখানি ছিল তা আর বুঝতে বাকি রইল না বৃন্দার।

'আমি এসব বেচে দেব।'

'ছিঃ ছিঃ, ওকথা মুখে এনো না মা, বড় দুঃখের দল। কত কষ্ট করে তোমার বাপ এসব জুড়ে গেছেন। বড় খোসামোদী করে ঐ খোল জোড়া এক জেলেকে দিয়ে আনিয়েছিলেন নদীয়া থেকে। ও খোল নিয়ে একবার আসরে ঢুকলে তার জয় অনিবার্য। ওর নাম শ্রীখোল।' অন্ধ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঠাকুর ভাইর সব কিছুই অমনি নাম করা, মায় কৃষ্ণের হাতের বাঁশীটি পর্যন্ত। দেখ না ফুঁ দিতে না দিতে লোক কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। আবার দল গড়তে হবে। তুমি হতাশ হয়ো না।'

'ভাঙা হাট মেলে সাধু? এই তো সবে ভাঙল।'

'মিলবে গো মিলবে—কৃষ্ণপদে মতি রাখ, সব হবে।'

'টাকা পয়সার কাজ কি করে চলবে। কৃষ্ণ এসে তো আর টাকার থলে এগিয়ে দেবেন না।'

'গঞ্জে অনেক দয়ালু মহাজন আছেন—তাঁরা ভক্ত, তোমাকে নিশ্চয় সাহায্য করবেন—দেখ না দুটো দিন সবুর করে।'

দুদিন আর দেরি করতে হলো না। অন্ধ যেদিন কূলে গেল সেইদিনই তিন চারটি ভক্ত দেখা দিল নায়ে।

বৃন্দা মন রূপ মাহুতের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করল। কান্নাকাটিও করল একা একা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চতুর্দিক রক্ষা করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ল কাঁটা তারে। প্রথম আঘাত লাগল যতদূর লাগার, তার পর সয়ে গেল সব।

অন্ধ বোঝাল যে, দশ জনকে উদ্ধার করার ব্রত যে গ্রহণ করবে তাকে ভারের চোটে ডুবতেই হবে অগাধ জলে, নইলে মানিক মিলবে না। তার ভাল মন্দ বিচারের মাপকাঠি অন্যের তুল্য নয়।

অর্থ সংগ্রহ হলো। আবার ভাঙা হাটে যেন দুটি একটি করে

লোক সমাগম হতে লাগল। দিনের পর দিন গড়িয়ে যেতে লাগল সুখে দুঃখে।

এমনি অনেক উত্থান পতনের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে বৃন্দা যেখানে গিয়ে ঠেকেছে এখন, সেইখানে গদাইর সঙ্গে দেখা। এবার গদাই রইল মাঝি হয়ে।

'সাধু, ভোর হলো, তামাক খাও—এই নেও কল্কি।'

বৃন্দা হুঁকোটা নিয়ে এগিয়ে এলো। 'কই কল্কি গদাই? কত্তাকে বাদ দিয়ে কেত্তন! আগে আমাকে দে, পেরসাদ করে দেই।'

'নেও দিদি, নেও—এত ভোরে উঠেছ কেন?'

দিকচক্রবাল রাঙা করে কে যেন আবীরের আলপনা দিয়েছে লঘু হাতে। নদীর এপার ওপার এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি—একটা ধোঁয়াটে ভাবে আচ্ছন্ন ওকূলের গ্রাম ও বনরেখা। তবু ভোর হচ্ছে, নতুন জীবনের একটা স্পন্দন শোনা যাচ্ছে মাঝি মাল্লার নায়ে। নামাজের তোড়জোড় করছে মুসলমান নেয়েরা—হিন্দুরা করছে সূর্যাভিবাদন।

বৃন্দার বড় ভাল লাগছে আজকার প্রভাতটি। নতুন আশা ও আনন্দ নিযে ও তামাক টানতে লাগল।

'গদাই, একটা কাজ করতে হবে তোকে।'

'কি?'

'সৌদামিনীকে খুঁজে আনতেই হবে।'

'বলো কি!' একটু আশ্চর্য হলো গদাই। যে এত নিন্দা করল সে-ই আবার ফিরিযে আনতে বলছে সৌদামিনীকে।

'আমি পারবনি বাপু—যার চাল চুলো নেই, স্বভাবে শুধু কালি—'

'অত রাগ করলে কি আর দল চালান যায় বোকা। মাথার শোভা কেশ সে-ই তো কালো তাই বলে কি তুই কেটে ফেলতে পারিস?'

'ভাল কথা বলেছ বিন্দেদিদি, ভাল। কালই যাব আমি খোঁজে।'

'গদাই, কালি না আছে কার অঙ্গে ?'

'হ্যাঁ দিদি, এমন যে চাঁদ সেও তো কলঙ্কিনী—কিন্তুন তার জোনাক (জ্যোৎস্না) বড় মিঠে।'

'অমনি গোলাপ ফুল, তার চারপাশেও বড় কাঁটা। ভয়ে পিছিয়ে এলে আর সুবাস পেলে না।'

'না দিদি, ভয় কি—আমিই যাব আনতে।'

ভোরের আবহাওয়া, তাতে গোলাপ ফুলের সঙ্গে তুলনা, একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে দা-কাটা তামাকের—সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

বৃন্দা বলল, 'আমার শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে পড়েছে, একটুতেই হাত পা টাটায়—বেশি খাটুনি আর পোষায় না। কিন্তু গড়ার মুখেই তো যত পরিশ্রম।'

গদাই জবাব দিল, 'তুমি কিচ্ছু ভেবনি, রাধাদিদি তেমন অবুঝ মেয়ে নয়।'

গদাই মনশ্চক্ষে দেখে যে দেশের শ্রেষ্ঠ নর্তক নর্তকীতে ভরে গেছে নৌকা। গাইন বাইনের আর অভাব নেই। বায়না আসছে চারদিক থেকে। ওর আনন্দে হৃদয় ভরপুর হয়ে ওঠে।

নৌকা ছাড়ার সময় গদাই বলে গেল, 'তোমরা কালীগঞ্জের খালের মোহানায় থেকো, আমি দু একদিনের মধ্যে ফিরলাম আর কি !' সে তড়িৎগতিতে নৌকা ছেড়ে ভাটিয়ে চলল দক্ষিণে।

সে চোখ বুঁজে দেখল কত মোহনবংশীধারী কৃষ্ণ ও কমলিনী রাই যেন নেচে বেড়াচ্ছে নদীর জলে, আকাশে বাতাসে, একূলে ওকূলে। দ্যুলোক ভূলোক কৃষ্ণ ও রাধাময়।

অল্প খোঁজেই এবার গদাই সন্ধান পেল রাধার। সে নাকি আছে ফুলপলাশীর এক বন্দরে। গদাই বেয়ে চলল নাও।

মাঝিমাল্লাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারল যে সৌদামিনী গাইন কদিন ধরে আছে নাকি ওপরে—অর্থাৎ কূলে।

'কোন ঠাঁই? ও বুড়ো ভাই, কোন্ দিকে?'

'খেয়াঘাটার বাঁয়ে।' বুড়োর কথা শেষ হতে না হতে আর একজন মন্তব্য করল, 'গাইন এখন পার করে···পুণ্যি করে।'

নাও রেখে গদাই ওপরে উঠল। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখল তখনও সন্ধ্যা হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই সাজগোজের সাড়া পড়ে গেছে। চুলের ফিতা আলতার শিশি, কোথায়ও বা সেমিজ সায়া নিয়ে কুরুক্ষেত্র হচ্ছে। প্রথমোক্ত জিনিস হয়ত ঘর থেকে চুরি গেছে, শেষেরগুলো অদল বদল হয়েছে উঠানের তারের ওপর থেকে।

বন্দরের ছোট ছোট ভাড়াটে বাড়ি। তিন চারজন বাসিন্দা, একটি করে তুলসী মঞ্চ, গুটিচারেক পাণ্ডুর জবা অথবা করবী ফুলের গাছ—আবার একটা হাউলি (অংশ)। বাড়িগুলোর শোভা ধবধবে শয্যা। থাক না থাক ওটা ঠিক রাখতেই হবে বাসিন্দাদের। দুচারখানা যুবতী নারীর নগ্ন অথবা অর্দ্ধ নগ্ন ফটোও আছে দেয়ালের গায়। এক একটি ঝকঝকে পানদানী ও পিকদানীও আছে প্রতি ঘরে। একটা পচা নর্দমা গেছে বাড়িগুলোর চারদিক ঘুরে। কোন কোন বাড়ীর ভিতর থেকে মদ ও মাংসের গন্ধ আসছে—ছাপিয়ে যাচ্ছে নর্দমার পূতিগন্ধকে।

ঝগড়া ও কলরবের মধ্যে গদাই শুনল শাঁখের আওয়াজ। অনেকে সেজেগুজে এসে প্রণাম করল লক্ষ্মীর আসনের কাছে। বোধহয় একটি রাত্রির জন্য কামনা করল স্বর্ণ, অর্থ ও মনের মত মানুষ। ভোর হতে না হতে তার সঙ্গে আর হয়ত সম্পর্ক থাকবে না, তবু সে সুন্দর, সৎ ও ঐশ্বর্যশালী হক—হক জীবন-বল্লভ।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলেছে ঘরে ঘরে। কজনে লম্ফ নিয়ে এলো দুয়ার ধারে এগিয়ে।

'কে গা, কি চাই? কাকে চাই?'

গদাই একটু সরে দাঁড়াল।

'একটা বিড়ি-টিড়ি দাও মশাই।' বলে একটি মেয়ে অপর দুটিকে পিছনে ঠেলে সুমুখে এসে মুখ বাড়াল।

মুখে বসন্তের দাগ, গায় গিলটির গয়না, পরনে জলো শাড়ি—তবু স্ত্রীলোক, বয়স উনিশের কোঠায়—গদাইর চোখে এনে দিল লজ্জা, সংকোচ ও বিস্ময়।

'কই গো চাঁদ, আঁধারে মুখ লুকালে যে!'

একজন এগিয়ে গিয়ে টেনে আনল গদাইকে। 'চাঁদ নয় লো, ভোঁদর।' সে ছেড়ে দিল গদাইর গলার গামছা। বিরক্তিতে ভরে উঠল তার মনটা।

গদাই ইতস্তত করতে লাগল। কি করবে, কি বলবে? বন্দরে সে অনেক দিন কাটিয়েছে, কিন্তু এসব দিকে সে কখনও আসেনি।

'আজকের সন্ধ্যেটা মাটি হলো—এমন বোবা খদ্দের তো কখনও দেখিনি।' দুটি মেয়ে সরে গিয়ে আর এক দরজায় দাঁড়াল।

লম্ফটাও তারা নিয়ে গেছে। যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল সে কেরোসিনের ভাগ দিতে পারেনি, তাই আলোর দাবীও নেই তার। তবু সে আলাপ করতে লাগল গদাইর সঙ্গে।

'ক আনা দেবে মশাই, এসো না ভিতরে। নতুন মানুষের লাজ ভাঙা এক দায়। এ খচ্চা কে দেয় বলো তো?'

এত কথার পরও গদাই ভিতরে ঢুকতে সাহস পেল না। অবশেষে মেয়েটি গদাইর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল।

'একটু ভাল করে হাত পা ধোও। ঐ জল রয়েছে উঠানে। খড়ম পরবে, না চটিজুতো? মা, তোমার পিদ্দিমটা একটু দেখাও—কাল ভোর হলেই তোমাকে তেল কিনে দেব।'

মেয়েটি গদাইর কাছে ফিরে এসে রহস্যমাখা সুরে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, সত্যিই কি তুমি বোবা? কি কাজ কর—কুলীগরি, না নায়ের মাঝি?'

'আমি পা ধোব না।'

'ক্যান?'

'আমি পয়সা দেব পাঁচ গণ্ডা।'

হাত পা না ধুয়ে, তামাক না খেয়ে, একটু বিশ্রাম না করে কেউ

যে পয়সা দিতে পারে—তা মেয়েটির জানা ছিল না। সে অত্যন্ত আশ্চর্য হলো এবং তার ভয়ও হতে লাগল পাছে খদ্দেরটি সরে পড়ে, সন্ধ্যাবেলার প্রথম খদ্দের। যা-ই সে দিক, তা আয়ের এবং মুনাফার—বাকি সারা রাতটা তো পড়ে রইল।

'তুমি অমন করছ ক্যান ভাই? আমরা মেয়ে মানুষ, আমরা তো বাঘ কুমীর নয়।'

মা হেঁকে উঠল, 'উঠানে দাঁড়িয়েই নুন-কটা করিসনি, ঘরে নিয়ে যা। যা দেয় তা-ই হাত পেতে নে, বৌনি কর। তোকে যে আর কত শেখাব হারামজাদী।'

'তুমি খুশি হয়ে যা দেবে, তা-ই নেব—হাত পা ধুয়ে ঘরে চলো।'

'না, আমি ঘরে যাব নি। পয়সা যা চাও তাই দেব, একটা খপর বলতে পার। পাঁচ আনা, দশ আনা, এই এক টাকা…'

'কি বলো তো?'

'এই রাধা গাইন কোথায় আছে?'

'সৌদামিনী দিদির কথা জিজ্ঞেস করছ? সে তোমার হয় কি?'

'এক গাঁয়ে বাস, এই এক্কেবারে পাশাপাশি বাড়ি—হয় আমার—'

'কী?'

'বোন।'

'আমিও তো তোমার বোন এক হিসেবে।' হাসল মেয়েটি।

মা আবার হাঁকল। 'মুদী বেটা দেখি এক্ষুণি আসবে—হাসা-হাসি করে সময় লষ্ট করছিস ক্যান? শেষকালে কালকের মত আজও রাতটা কি কাটবে উপোসী। ওলো, ঝটপট কর।'

'চুপ কর তো মা। তুমি অমন করলে আমি আর কথা বলব নি খদ্দেরের সাথে। তোমার নোলায় এত জলও দিয়েছিল বিধাতা।'

'কি বললি, কি? আমার নোলায়ই শুধু জল দেখলি—দাঁড়া হারামজাদী, দাঁড়া।' বলে পঙ্গু মা একবার উঠতে চেষ্টা করল। 'শুনি কার নোলায় জল না আসে রে স্মুমুখে খাবার দেখলে?'

মেয়েটি চুপে চুপে গদাইকে বলল, 'তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই, মায়ের আমার মাথা খারাপ।'

গদাই শুধু জবাব দিল, 'না, না…'

দুজনে এগিয়ে চলল সুমুখের দিকে।

'তুমি ভাই যাকে চাচ্ছ সে ও বাড়ি আছে। বড্ড ভাল মেয়ে, সেদিন আমাকে সাথে নিয়ে গিয়েছিল পবনপাড়া—দুটাকা নগদ পাইয়ে দিয়েছে। আমি শুধু দাঁড়িয়ে ছিনু সখী সেজে।' তারপর মেয়েটি চাপা গলায় বলল, 'ধীরে ধীরে আমার পেছু পেছু এসো।'

পথ চেনে না গদাই—তাই সদ্য পরিচিতা মেয়েটি হাত ধরে তাকে নিয়ে চলল আঁধারে।

স্থূল শরীরের একটা যজ্ঞশালা। নানাবিধ আহুতি চলছে রাত্রির এই অন্ধকারে। গদাইর মন ক্লেদে ভরে উঠল। এখানে কেন সৌদামিনী এসেছে? ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেও এ যেন তার উপযুক্ত স্থান নয়। কুল ছেড়েছে, তাই বলে কি ভাসবে অকূলে?

একখানা ছোট্ট ঘরে ঢুকে দুজনে দেখল যে সৌদামিনী একটা ময়লা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে। পাশে একটা বাতি জ্বলছে। আলোর চেয়ে ধোঁয়া হয়েছে বেশি। গদাইর বুকে কে যেন একটা লগি দিয়ে সজোরে গুঁতো দিল।

গদাই মুখের চাদরটা সরিয়ে ফেলে ডাকল, 'রাধাদিদি, রাধাদিদি!'

রক্তবর্ণ চক্ষু মেলে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করল, 'কে, এসেছিস গোলক?'

'না, আমি তোমার গদাই।'

চোখ বুঁজল সৌদামিনী। প্রাণটা টাটিয়ে উঠল গদাইর।

একটি সাতাশ আঠাশ বছরের মেয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করল। 'তোমরা কি চাও?'

'আমি ওঁকে নিতে এসেছি।'

'ঘরের কেরায়া এনেছ?'

'কত ?'

'আড়াই টাকা।'

'এই নেও,—তুমি বলতে পার রাধাদিদির কি হয়েছে ?'

'পেরেমের জ্বর—তুমি এখন ঠাণ্ডা কর গে।'

গদাইর সঙ্গে সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছিল পথ দেখিয়ে সে খুবই সাহায্য করল গদাইকে। গদাই সৌদামিনীর জ্বরতপ্ত দেহ কাঁধে তুলে নিল। আলো ধরে এগিয়ে চলল সেই মেয়েটি ষ্টেশনের নিকট পর্যন্ত।

'এখন তুমি যাও; হ্যাঁ একটা টাকা নিয়ে যাও।'

'কিসের জন্যি ?'

'তুমি তো খাটলে !'

'ট্যাকায় অঙ্গ জুড়াবে নি, একদিন এসে বাতাস দিয়ে যেও।' মেয়েটি এগিয়ে চলল।

গদাই সৌদামিনীকে নায়ে শুইয়ে রেখে ছুটে এলো। 'টাকাটা নিতেই হবে, নইলে তোমার মা আর আস্ত রাখবে না।' গদাই হাত বাড়িয়ে দিল।

মেয়েটি তাকে টেনে ধরে হঠাৎ একটা চুমো খেল। 'এত বুদ্ধি তোমার ! আজ বাকি থাক, আর একদিন এসে দিও।'

জীবনে নারী মুখের এই প্রথম চুম্বন। গদাই শিউরে উঠল। তারপর বিস্ময়ে ভরে গেল তার মন। সে ঠাহরই করতে পারল না যে হল কি ! তার মত চির কুৎসিতের মধ্যে এমন কি গুণ থাকতে পারে যে সে লাভ করল এক সদ্য পরিচিতার চুম্বন। সে নারী যতই ঘৃণ্য হক না কেন—আসলে সে রক্ত মাংসের মানুষ তো। তাই বারংবার কণ্টকিত হয়ে উঠতে লাগল মূঢ় কুরূপ গদাই।

দশ

রাধা বংশীদাস বাবুর থাবা এড়িয়ে তাকে একটা ঘোলায় ফেলে নিজে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে অনেক। নাও কেরায়া করেই কাটিয়েছে বেশির ভাগ সময়। নদী এবং জলে যদি ঠাণ্ডা হয় তার দেহ।

তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পিছনে যে একটা শঠ চক্রান্ত ছিল, তা সে বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। কাকে সে অবিশ্বাস করবে? বৃন্দাকে, না গোলককে? ওরা দুজনেই যে তার ভাবলোকের পরিচিত বন্ধু—মূর্ত হয়েছে ইহলোকে।

তবু সে আঘাত পেল, তাই নাও ছেড়ে কূলে উঠল এবং ফিরে এলো না আর বৃন্দার নায়ে। সে দ্রুত হাওয়া মহল ছাড়িয়ে গঞ্জের পথ ধরে হেঁটে চলল। চেনে না পথের একটি বাঁক, এমন আধভাঙা সুরকির পথ চলেনি কখনও একা একা—কিন্তু তাতে কি হয়? ভিতরের বিক্ষোভ ওর দেহে একটা প্রচণ্ড বল সঞ্চার করল। জোগাল সাহস ও উত্তেজনা।

সৌদামিনী এগিয়ে চলল, বৃন্দা কিছু বলতে পারল না।

শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সুখময় তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর যেন পরিবর্তিত হতে লাগল মরুভূমিতে। রুক্ষ ও কঠোরের জ্বালাময়ী স্পর্শে পুড়ে খাক হতে লাগল সব!

রাধার জীবনে আজ থেকে আরম্ভ হলো সত্যিকারের বেদনাদীর্ণ ইতিহাস। সংগ্রাম শুরু হলো গতানুগতিক জীবন ধারণে।

রূপ যার নেই তাকে বিধাতাই ঠকিয়েছে, আর রূপ যার আছে তাকে মানুষ চায় ঠকাতে।

রাধার পিছনে মধুমক্ষিকা জুটল অনেক।

সে তাদের তাড়িয়ে দিল। যদি সে মধু বিতরণই করে, করবে একা গোলককে। গোলককে ঘিরে এখনও তার স্বপ্ন-স্বাদ-আশা-দুরাশা সূর্যমুখী ফুলের মতই পাপড়ি মেলছে। সে যেখানেই গিয়ে থাক—আসবে। ফিরবে রাধিকার কুঞ্জে। নূপুর তার এখনও কানে বাজে।

'একটু জল।'

গদাই মুখের কাছে এগিয়ে এলো। 'এই নেও।'

'তুমি কে?'

'চেন না আমাকে? আমি—'

'মুখ সরাও, আলো নিভাও।'

গদাই থতমত খেয়ে বসে রইল। নাও চলছে স্রোতের টানে।

জীবিকার জন্য সৌদামিনীকে আবার নতুন করে নামতে হলো গাইতে। এবার সে কোনও দলের সঙ্গে বাঁধা মাইনেতে থাকবে না। গাইবে ফুরণে। স্ত্রী পুরুষ যে কোনও চরিত্র নিয়ে সে নামতে রাজি আসরে। ফুরণ ফুরাবে অমনি সে চলে যাবে।

এভাবে অনেকদিন কাটল, তবু গোলক ফিরে এলো না। সৌদামিনী গান গায় বটে কিন্তু তার কান থাকে অন্য দিকে। মনের ঘরে তো তার বহুদিন আগেই হয়েছে নিষ্ঠুর ডাকাতি।

একদিন এক অধিকারী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সে গলা গেল কোথায়?'

একজন কৃষ্ণ বলল, 'চেহারাও তো অনেক শুকিয়েছে।'

সৌদামিনী একটু ম্লান হাসি হাসল।

'গেল, গেল আমার পা খানা গেল।'

বৈঠা ফেলে গদাই ছুটে এলো। নাও পাক খেতে লাগল।

পায়ের মাংস পেশীতে খিঁচুনি ধরেছে। প্রথমে গদাই সজোরে টিপে দিতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে নরম হাতে।

'আঃ! বড় ভাল লাগছে। তুমি কে?'

'আমি,—আমাকে চেনতেই পারলে না তুমি!'

'যাও, যাও—আমি স্ত্রীলোক। আমার কাছ থেকে পালাও।'

গদাই তাড়াতাড়ি অপরাধীর মত উঠে গেল।

'এবার তো তোমার তেমন গান জমছে না গাইন—তোমার কত নাম?…' বলল সেই কৃষ্ণ।

সত্যই সৌদামিনী নিজের অক্ষমতার কথা বুঝতে পারছিল। কোন উত্তর না দিয়ে রাত্রির আসরের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হলো। আজ জমাতেই হবে সভা।

পালা হবে রাই উন্মাদিনী।

সেবার গাছ থেকে পড়ে মদন ধোপার সুমুখের দুটি দাঁত পড়ে গেছে। তাকে কৃষ্ণ সাজালে বিশ্রী দেখায়। কিন্তু এ দলে আর তেমন উপযুক্ত মানুষ নেই। ছোকরা দুটি আছে—শুধু খেতে জানে, এক একটি যেন আধমনী কৈলাশ—গাইতে জানে না। কৃষ্ণকে এক প্রকার বাদ দিয়েই যে পালা হয়, বেছে বেছে সেই পালাই ধরা হলো। আশ-পাশের লোক সৌদামিনীকে চিনত, একদিন যদিও গান তেমন জমেনি, আজ নিশ্চয় আসর মাৎ হয়ে যাবে। লোক আসতে লাগল দলে দলে।

গান আরম্ভ হতে না হতেই আলোর দিকে চেয়ে সৌদামিনী কেমন যেন ব্যাকুলতা অনুভব করল। ঢোল, খোল, মৃদঙ্গ মন্দিরা যখন ঐক্যতানে বেজে উঠল, সে আর তার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারল না।

কৃষ্ণ নেই, রাইর কৃষ্ণ ফাঁকি দিয়ে মথুরায় চলে গেছে। আঁধার করে গেছে নিকুঞ্জ, যমুনা, কেয়া-কদম্ব তল। শুকসারী আর মনের

আনন্দে গান গায় না, নাচে না ময়ূর ময়ূরী পেখম মেলে। যমুনা যেন কাঁদছে···

আর আমাদের রাই হয়েছে উন্মাদিনী। এতো মথুরার রাই নয়, কুলে কলঙ্ক লেপে বেরিয়ে আসা সৌদামিনী।

রাধা গান ধরল—

সবাই বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে কান পেতে রইল। পালার শুরুতেই আরম্ভ হলো শেষের গান। অধিকারী মাথায় হাত দিল—বাজনাদারের তালভঙ্গ হতে লাগল।

কৃষ্ণ একটা বিড়ির আগুন নিবিয়ে রইল লজ্জায় বাইরে দাঁড়িয়ে। তার ভাঙা দাঁত দুটোর ফাঁক স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে গান এমন পর্যায়ে গেল যে বাজনাদার নিজেই বাহবা দিয়ে মৃদঙ্গে ঘা দিল। বাজতে লাগল করুণ স্বরে মন্দিরা। ঢুলি নিজের অজ্ঞাতেই ঢোল নিয়ে দাঁড়াল।

কি পালা হচ্ছে, কতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি হলো হাতে লেখা প্রচলিত পুঁথি থেকে, সেদিকে কারুর নজর নেই এখন। সভা সমেত লোক উন্মাদিনী রাইর জন্য ব্যাকুল। জেলে, ধোপা, সামন্ত, সর্দার, গ্রাম্য গোয়ালার সভা—তাদেরই স্ত্রী পুরুষে ভরা চারদিক, হয়ত কিছু তাঁতী এবং সৌখিন মুসলমান কৃষাণও আছে—সকলেরই অন্তর বিগলিত। এসেছে প্রেম, নেমেছে বিরহের দুরন্ত বন্যা।

দাঁত ভাঙা কৃষ্ণের এক একবার ইচ্ছা হলো যে এগিয়ে গিয়ে রাইয়ের চরণ জড়িয়ে ধরে। তার জীবনে এমন অভিনয় কখনও দেখেনি। শোনেনি এমন মধুক্ষরা কণ্ঠ।

একটা অস্ফুট শব্দ করে রাধা অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

টের পেয়ে গদাই স্রোতের মুখে নাও ভাসিয়ে দিয়ে ছইয়ের ভিতর চলে এলো।

'রাধাদিদি, রাধাদিদি।' তাড়াতাড়ি লম্ফ জ্বালাল গদাই। 'রাধাদিদি, কথা কও।' আর কি বলা যায়, আর কি করা উচিত,

কিছু একটা দিশাই করতে পারল না আহম্মক গদাই। সে রাধার জ্বর তপ্ত দেহখানি কোলে তুলে নিল। গামছা ভিজিয়ে একটু একটু করে জল দিল কপালে।

ঐ গানের আসর থেকে অসুস্থ হয়েই সৌদামিনী গিয়ে ভাড়া করেছিল সেই ঘরখানা। ভাল মন্দ ভাববার তার তখন অবকাশ ছিল না।

নাও ভাসতে ভাসতে একটা চরে এসে ঠেকল। মনুষ্য-বর্জিত চর। রাত্রির অন্ধকারে দেখা যায় না আদি অন্ত। দূরে কোথায়ও একটি নক্ষত্র-বিন্দুর মত দূরগামী মাঝির নৌকার আলো দেখা যায়। আর সবই অন্ধকার। জলকল্লোলে শুধু বোঝা যায়, এটা একটা বড় নদী—মাঝখানে ভাসান-চর।

গদাইর শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল রাধার দেহের উত্তাপে। কি চোখ, কি মুখ, কি লাবণ্যময় মুখের ডৌল। রেণু রেণু ঘাম ফুটে উঠেছে সুকুমার গালে ও কপালে। রুখু রুখু চুলগুলি একটু একটু যেন নড়ছে। লম্ফের শিষ্‌টা ভাল করে ঝেড়ে দিল গদাই।

কুরূপ গদাই এমন সুরূপা নারী কখনও এভাবে এত নিকটে বসে দেখার সুযোগ পায়নি। সে সেবা করতে করতে মাঝে মাঝে ভুল করতে লাগল। কেন এ ভুল তা সে যেন জানে না। যুক্তিহীন অবোধ মন শুধু উপলব্ধিতেই ভরে উঠতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক বাদে রাধা একটু যেন সুস্থ বোধ করল।

গদাই তাকে আবার শুইয়ে রেখে গলুইতে গেল। বহুকালের পরম বাধ্য ভাড়াটে মাঝির মত বাইতে লাগল নাও। আজ ওর জীবনে কি যে একটা দিন তা সঠিক ও বুঝল না। কেবল এইটুকু বুঝল—ওর খুবই ভাল লাগছে, ওর অন্তর যেন নাচছে। অথচ ওর নায়ে এক বিস্রস্ত বসনা রোগিণী।

অন্ধকারে একা গলুইতে বসে অনেক কথা ভাবে গদাই। সে কি

ভালবাসে, না তার ভাল লাগে সৌদামিনাকে? ভালবাসা কি? কেন কাতর কৃষ্ণ রাধার জন্য?

সেও তো এতদিন কাতর ছিল সৌদামিনীর জন্য। তবে সে নিশ্চয় ভালবাসে। না, না, ভাল সে ঠিক বাসে না, রাধাকে ভালবাসার অধিকার গদাইর মত মানুষের নেই। তবে তার খুব ভাল লাগে রাধার সান্নিধ্য,—এই যে একলা নিয়ে চলেছে।

আসুক না ভূত প্রেত যক্ষ দানা। সে বৈঠা দিয়ে শিরদাঁড়া ভেঙে দেবে। ছুঁতে দেবে না অসুস্থ সৌদামিনীকে।

ওর মনে হলো সৌদামিনীর সমস্ত অসুখের জন্য দায়ী একটি লোক। তাকে আর কখনও দলে ভিড়তে দেবে না। সেই নচ্ছারটাই কি যেন ওষুধ পত্তর খাইয়েছে—করেছে গুণ-জ্ঞান। নইলে বারবার ওর নাম করে কেন রাধারাণী? একবার বাগে পেলে হাড় ভেঙে দেবে গদাই।

গদাই জোর জোর চাল্লি (চাপ) দিয়ে নদীর জল ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

অমাবস্যার রাত্রি, আদিগন্ত কালিমাখা, কানে আসে শুধু জল-তরঙ্গ সংঘাতের শব্দ। তেমনি একটা সংঘাত চলতে লাগল গদাইর মনে। গোলক যেন চুপি চুপি এগিয়ে আসতে চাইছে, ও কিছুতেই তা সহ্য করবে না। সে যেন আকুতি জানাচ্ছে। কিন্তু এখানে মায়া মমতার প্রশ্ন অবান্তর, নিষ্ঠুর প্রতিরোধই প্রয়োজন।

গদাই মত্ত মাতঙ্গের মত বেয়ে চলেছে নাও।

এগার

বৃন্দা বলল, 'তোর কি বাপু কাণ্ড জ্ঞেয়ান নেই, রোগা মানুষকে নিয়ে এলি ক্যান ?'

'তবে কি আমি ফেলে আসব এ সময় ?'

'ফেলে আসার কথা কে বলছে ? রেখে এলেই পারতিস। যারা ওকে এতদিন আদর যত্ন করেছে তারা আর পায় ঠেলত না। একটু ভাল হলে না হয় ফের একটু কষ্ট করে নাও বেয়ে যেতিস। কি যে বুদ্ধি তোর।'

'তোমার মত আমি অত কূট নই।'

'হারামজাদার জবাব শোনো। আমি নাকি কিছু মন্দ বলেছি। নাও পথে একটা ডাক্তার বদ্যি মেলে, না জোটে এক দাগ ওষুধ ? বাড়াবাড়ি হলে সামলাবে কে ?'

'তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে নি।'

সৌদামিনীকে লক্ষ্য করে বৃন্দা এবার বলল, 'শোন্ বোন, ওর আক্কেলের কথা। এতদিন বাদে তুই এসেছিস, আমি নাকি তোকে অনাদর করব ! অত যদি গতরের দিকে চাইতাম তবে আর দল রাখতে পারতাম না।'

গদাই রাগে ফুলে আর একদিকে চলে গেল।

সৌদামিনী বলল, 'তুমি ওর সঙ্গে কেন যে কথা কাটাকাটি কর দিদি। তার চেয়ে কাছে বস, কতদিন বাদে ভগবানের নিতান্ত অনুগ্রহে আবার দেখা হলো।'

'এখন আছিস কেমন, শরীরটা—' কপালে হাত দিয়ে বৃন্দা বলল, 'জ্বর দেখি এখনও প্রবল।'

'সন্ধ্যে নাগাত আরও বাড়বে। যাক, একটা কাজ গদাই মন্দ করেনি, মরলেও আমি তোমার কাছে বসে মরব।'

'আহাহা, মরবি কেন তুই—বালাই বালাই।'

'আমার বেঁচে থেকে লাভ?'

বেলা খুব বেশী হয়নি। নৌকার ভিতর উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে। বৃন্দা ওর মুখের দিকে চেয়ে বুঝল, আসল রোগ অনেক গভীর স্তরে এবং পূর্বের ক্ষত একটুও নিরাময় হয় নি। দিন দিন পুরান ও জটিল হয়েছে মাত্র।

'গদাইর মুখে সবই শুনলাম, একে একে সবাই এসে জুটেছে।' এরপর রাধা একটা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বিরাম দিল কথায়। তারপর বলল, 'ভাল করেছ, তোমার আশা পূর্ন হক।'

'কিন্তু একটি জিনিসের যে অভাব রইল।'

সে অভাব যে রাধারও, সে আর কি বলবে!

ঠিক মধ্যাহ্নে অনেক বোনাজি লতাপাতার গাদা নিয়ে বৈদ্য গদাই হাজির হলো। সে কতক বেটে রস করল, কতক জ্বাল দিয়ে বোতলে ভরল। এখন শ্রদ্ধা করে ওর ওষুধ খেলে হয়।

'রাধাদিদি অবেজ্ঞা কোর নি, দুদিন খেয়েই দেখ—রামদাস কবরেজ আমার গুরু। তার কথা তো তুমি জানই।'

'ওষুধ খেয়ে হবে কি?'

'বাঃ বাঃ তুমি আশ্চজ্জি করলে, অসুখ ভাল হবে।'

'তবে রেখে যা ঐখানে।'

গদাই কেবল ওষুধই নয়, পরিষ্কার মেটে কলসীর থিতান জলও রেখে গেল এক ঘটি।

রাধা নির্বিকার চিত্তে সব ওষুধটুকু ঢেলে ফেলে দিল নদীর জলে।

দিনের পর দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। অসুখ ভাল হয় না সৌদামিনীর। জ্বর যেমন আসার তেমনি আসে, অচৈতন্যও হয় মাঝে মাঝে। ঠিক সেই সময়ই গনগন করতে থাকে বৃন্দা। গদাই থাকে চুপ করে।

'একখানা নাও আটকা রইল, কাজও হচ্ছে না কিছু।...একেই বলে পরের ওপর খাই ভাত, কাপড় পরি চৌদ্দ হাত।' আরও অনেক কথাই বলত বৃন্দা, এবার গদাইর অসহ্য হয়ে উঠল।

'নাও তো তোমার নয়, আমি যদি কেরায়া না বাই।'

'তোর তো আছে কেবল কথায় কথায় রাগ। একটা দিন যায় আর মাইনে ভজে ক টাকা, সে ভাবনা কি ভেবে দেখেছিস ?'

'তবে কি করতে বলো ?'

'বলি শ্রীমুখের দিকে চেয়ে দিন রাত্তির বসে থাক। দল থাক আর নাই থাক, তোদের কি! এই আমি চললাম।' বৃন্দা উঠে গেল।

এমন ওষুধ তবু কেন জ্বর ছাড়ে না ? যে সব বোনাজি তাতে জ্বর তো দূরের কথা যমও বাপবাপ করে পালায়। গদাইর সন্দেহ হলো।

শেষ বেলায় যখন সূর্য অস্ত যায় যায়, তখন গদাই হাতে হাতে ধরে ফেলল সৌদামিনীকে।

'এত অছেদ্দা আমাকে রাধাদিদি, এত অচ্ছেদা! কত জঙ্গল খুঁজে আমি নিত্যি বন-ওষধি জোগাড় করি, আর তুমি কিনা দেও ফেলে!'

সৌদামিনীর মুখ আঁধারেও লজ্জারুণ হয়ে উঠল।

সত্যই তো গদাই ওর জন্য না করছে কি!

'এই দেখ, আমার কাঁটায় কাঁটায় হাত পা কি হয়েছে—তুমি তো অবুঝ নও।'

আকাশে আলো নেই, অস্ত গেছে সান্ধ্য সূর্য পশ্চিম পারের বাঁশ ঝাড়ের অন্তরালে। দূরে দেখা যাচ্ছে তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ। সবে আবার জ্যোৎস্না পক্ষ শুরু হলো।

'আচ্ছা কাল থেকে আর ফেলব না, তুই এখন নিজের কাজে যা।' বলে সৌদামিনী পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

গদাই আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আর দাঁড়াবার

সুযোগ রইল না। সে কথার বোঝায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বেরিয়ে এলো·ছই থেকে। তৃতীয়ার চাঁদের ওপর ভেসে এলো এক ফালি লঘু মেঘ।

গদাই বাইরে এসে বৃন্দার নায়ে যার গলার স্বর শুনল, তাতে তার আপাদ মস্তক ঝাঁঝাঁ করে উঠল।

গোলক দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে কল্কি হাতে করে তামাক টানছে। আগুনের ফুলকি উড়ছে প্রতি টানে! গায়ে তার কোন দলের যেন একখানা ছেঁড়া পীতবাস জড়ান।

বৃন্দা বলল, 'একটু দেখে আয়।'

'যাই গো। গেলেই তো প্যানপ্যানানি। তার চেয়ে মন্দ লাগছে না তোমার কাছে একটু বসতে।'

বৃন্দা যেন সন্তুষ্ট হয়ে হাসল।

'তা ব'স্ ব'স্—তামাক খা!' বৃন্দা নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখল চকিতে।'

হয়ত ভুল বুঝল। কিন্তু এই ভুলের বিত্ত নিয়েই তো কত হাজারো মানুষ মশগুল!

গোলক বলল, 'ঐ না গদাই! বেশ বেশ, এক দেশের সবাই জুটেছি আবার একদলে। তুই এখানে কি করিস? তামাক খেয়ে যা।'

'আমি বাঁশী বাজাই, তামাক খাই নে।' সে একটা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী করে দেখিয়ে দিল।

'ও বাবা, এর অর্থ কি বৃন্দাদিদি? ও এখানে করে কি?'

'ও দলের ধন্বন্তরি। আজকাল চিকিচ্ছে করছে রাধার, এরপর করবে তোমার।' বৃন্দা রহস্যভরা সুরে একটি পদ আওড়াল—

'ও যে জ্বর বিকারে নাড়ী ধরে···'

গোলক বাধা দিল—'না লো সই, ও তো রাতের বেলা
ঘুমের ঘোরে···'

তারপর ধীরে ধীরে গাইল—'নারী ধরে···'

'দূর, চুপ কর গোলক, ও ভাববে কি। তুই বড় অসভ্য।'

কল্কির আগুনের মত গদাই তেতে উঠল। দেখে শুনে একটা খাটো বয়রা বাঁশের শক্ত লগি টেনে নিয়ে মারল এক ঘা সজোরে।

'গদাই!' ঠিক সেই মুহূর্তেই ডাকল সৌদামিনী।

'যাই।'

আঘাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, তবু লাফিয়ে উঠল গোলক।

'কে গান গায়? কার গলা শুনলাম? কে রে গদাই?'

ছইয়ের ভিতর দিয়ে গদাই জবাব দিল, 'গোলক।'

অনেক দিন বাদে বিছানায় উঠে বসল সৌদামিনী। 'তুই যে কেমন মানুষ, লম্ফটাও একটু জ্বালিস নি। আলো আন।'

গদাই আলো নিয়ে ফিরে এসে দেখল সৌদামিনী কাপড়-চোপড় অন্ধকারেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছে।

'তুমি কি উঠবে নাকি?'

'না রে পাগল, না।'

'তুমি যে বসলে?'

'আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।' জ্বরে দেহ পুড়ে যাচ্ছিল, তবু বলল, 'আজ আর আমার জ্বর আসে নি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁরে হ্যাঁ। তোর ওষুধের গুণ আছে।'

'ঠাট্টা করছ? একদিনও তো খেলে না।'

'তেমন ওষুধ হলে গন্ধেও যে কাজ হয়।'

গদাইর বিশ্বাস হলো না।

'একবার ওকে ডেকে দিবি ভাই।' অতি মিষ্টি কথা, অতি মধুর সম্ভাষণ, তবু কেন জানি তেমন ভাল লাগল না গদাইর। ও নাও থেকে বেরিয়ে এসে নদীর জলের দিকে চেয়ে রইল। আকাশের লক্ষ তারা মুখ দেখছে জলে। পাশাপাশি নাও তিনখানা কাঁপছে। কাঁপছে নায়ের মূর্খ মানুষটার মনের মত।

'গদাই!' ছইয়ের ভিতর থেকে ডাক এল।

'জবাব দেও না ক্যান গোলক? তোকে ডাকছে।' গদাই বলল।

বৃন্দা বলল, 'যা, যা ওঠ'।

গোলক সৌদামিনীর নায়ে এলো। গদাই অমনি বৃন্দার নায়ে চলে গেল।

আকাশে তখন চাঁদ ছিল কিনা বলতে পারে না গদাই।

বার

অসুখ ভাল হতে সৌদামিনীর তেমন সময় লাগল না। দেখতে দেখতে এত বড় রোগ যেন পালাল যাতুমন্ত্রের স্পর্শে। দলে আবার জুটল এসে গাইন বাইন সুন্দর সুন্দর ছোকরা। ভাঙা ধনুক জোড়া তাতে দিয়ে বাঁধা হলো। ময়লা, বাক্সে তোলা বাঁশাটা নামিয়ে মেজে ঘসে ঠিক করা হলো তেঁতুল দিয়ে। শ্রীখোলের অংগে উঠল নতুন সালুর আস্তরণ। জোগাড় হলো শিখাপাখা পীতধড়া। সাজিমাটি গুলে গেরুয়া বসন ছুপিয়ে নিল দলের সাজানদার। এলো কেয়ূর কুণ্ডল বিলেতি উলের বনমালা। বাক্স মৃদংগ খোল করতালে ভর্তি হলো একখানা নাও। বাজল ঘুঙুর ও বৈরাগীর একতারা।

বংশাদাস বাবুর হয়েছিল কঠিন সান্নিপাত। চোখ দুটো তার গেছে জন্মের মত নষ্ট হয়ে। বড় গ্লানি হয়েছে তার এই পার্থিব জীবনের ওপর। সে একবার ডেকে পাঠিয়েছে বৃন্দাকে। কি যেন বলবে, কি যেন শুনবে—হাওয়া মহল এখন তার অন্ধকার।

জলতরংগের সঙ্গে ঐক্যতান মিশিয়ে যেন মৃদংগ মন্দিরা বাজছে, বাজছে শ্রীখোল, বাজছে ঢোল। আবার বৃন্দা উতরোল করে তুলেছে চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ, বন্দর-হাট। তার ঠাট দেখলে চমকে যেতে হয়। ঢপের দলের কীর্তন গেয়েই সে গাইতে পারে নিমাই সন্ন্যাস পালা। এমন দুটো পরস্পর বিরোধী দলের একত্র সমবায় করতে পেরেছে বৃন্দা বলেই। প্রথম আদিরস, মধুর কীর্তন তারপর জ্ঞান বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস।

আবার দামিনী ঝলকে উঠেছে, মৃতপ্রায় কেয়ার ঝাড়ে যেন ঘন ছোপ পড়েছে বর্ষার—জেগেছে সদম্ভে সবুজ পাতার ঝংকার, ফুটেছে উগ্রগন্ধী ফুল। সৌদামিনী আনন্দে অধীর।

তাই সে গান গেয়ে ফিরে আসার পথে বেতের লতায় জড়িয়ে পড়েছিল।

গদাই হাসুয়া চালিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিল। দিয়েছিল হাড়মুড়মুড়ি পাতার রস বেটে। গদাই সব কিছু এগিয়ে জুগিয়ে দেয়, সৌদামিনী গ্রহণ করে—কিন্তু বিধাতার কি অভিশাপ, মন ভরে না গদাইর। ও অনেক সময় একা গিয়ে নিরালায় বসে থাকে। কত কি যে ওর ভাবনা তা কি ও কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারে! মনে হয় যেন ও মুখ বিকৃত করে রয়েছে।

এবার সৌদামিনী ফুরণে গান গাইছিল। দলে আছে, অথচ নেই—যখন ইচ্ছা চলে যেতে পারবে। পালা শেষ হওয়ামাত্র আদায় করে নেয় মজুরি। ভুগে ভুগে ঘা খেয়ে বুঝেছিল তার একটা অর্থের প্রয়োজন আছে। মনের ইচ্ছা সার্থক করতে গেলে যখন-তখন দরকার হয় টাকার। বিশেষত গোলক সময় অসময়ে এসে হাত পাতে। একমাত্র টাকা দিয়েই তাকে অনায়াসে বাধ্য রাখা যায়। সৌদামিনী দেখতে চায় কত অর্থ পেলে খুশি হয় গোলক।

একদিন গোলক বলে, 'তুই ভাবছিস আমি বুঝি নষ্ট করি টাকা। এই দেখ একুশ টাকা ধার নিয়েছে অন্নদা তার বোনের বিয়েতে। মালতী নিয়েছে পনর। হিসেব সব ঠিক করে রেখেছি—আদায় হয়ে যাবে দল ভাঙার সময়।'

'মালতীকে দিলি কেন?'

'তার মায়ের ব্যামো!'

'ও।' মনে একটা কষ্ট হয় সৌদামিনীর তবু আর কিছু বলে না। এত কষ্টের টাকা!

'আমরা এবার ঘর বাঁধব। আমিও মন্তর নেব, কণ্ঠি বদলাব দুজনে। একটা জায়গা দেখে এয়েছি অন্নদাদের বাড়ির পুব পাশে। কত ফলকর গাছ-গাছালি,—সুন্দর বাড়ি হবে একখানা।'

বড় ভাল লাগে সৌদামিনীর এসব শুনতে। আর কিছু নয়

বাড়ি—নিজের বিত্ত, শাবক প্রত্যাশী বিহংগ বিহংগিনীর মত একটি নীড়। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর তুলসী মঞ্চও একটি সেখানে থাকবে। সন্ধ্যাবেলা জ্বলবে সান্ধ্য প্রদীপ।

'তোর হাতের টাকা পয়সা কি করিস, যা মাইনে বাবদ পাস? আমি নেব না, ভয় নেই, শুধু শুনব।'

'টাকা কি হাতে রাখলে থাকে! সব দাদন করে দিয়েছি গাইনদের। ওদের মাইনে কত কম। দেবে তিরিশে জৈষ্টি সেই দল ভাঙার সময়। দেখিস যেচে দেবে হাতে এলে।'

এ উদারতা বোকার লক্ষণ—বুঝেও কিছু বলতে পারে না সৌদামিনী। আবার ভাবে, ওরা দায় ঠেকে এমনি নেয়, হয়ত সময় মত ফিরিয়ে দেয়, নইলে কাজ-কারবার লেন-দেন চলে কি করে? আদান-প্রদান থাকা ভাল, সময়-অসময় সবারই আছে।

ওরা ভাববিলাসী বৈরাগী। যেমন গোলক তেমনি সৌদামিনী। তবু ওদের ভিতর যে একটা বৈষয়িক সম্পর্ক গড়ে উঠছে, এটা মন্দ লাগে না। অর্থের একটা মধুর স্বাদ আছে।

গোলক বলে, 'ওরা বিনে সুদে ধার নেয়নি—কিছু কিছু বাড়তিও দেবে। লোক কেউ মন্দ নয়।'

'ভাল রে গোলক, ভাল। আমার হাতের টাকা তোর হাতে গিয়ে বাড়ছে, ভাল।'

'এই দেখ, আমি আর একটা কায়েমী কাজ করেছি—এক পুরুষে আর ভাঙবে না। এখন হারিয়ে না গেলে হয়, কেউ আবার চুরি করে না নিয়ে পালায়। দাম নিয়েছে এক টাকা দশ আনা। কাশী ঢুলির বাবা এনেছিল গয়া থেকে, পেরায় তিরিশ বছর আগে।' অতি উৎসাহে দুঃসাহস করে বলে ফেলে গোলক।

'জিনিসটা কি?' আগ্রহে এগিয়ে আসে সৌদামিনী।

"দেখাতে পারি তোকে, কিন্তু বলবি নে কারুকে।' গোলক নৌকার পাটাতনের তক্তা তোলে। তুলে একটা ছোট্ট থলে বের করে। এদিক ওদিক তাকিয়ে থলের ভিতর হাত দেয়।

'যাবি নাকি সৌদামিনী?' পানের রসে মুখখানা রাঙিয়ে বৃন্দা এসে হাজির হয়। 'আমরা সবাই আজ রাত্তিরে আর ফিরব না।'

গোলক তাড়াতাড়ি থলেটা নামিয়ে রেখে পাটাতন বন্ধ করে। 'যা না মন্দ কি, একটা রাত্তির বইতো নয়। বৃন্দাদিদির সাথে বেড়িয়ে আয়।'

'কোথায় যাব, কোথায় যাব শুনি?'

বৃন্দা বলল, 'ন্যাকা, যেন কিচ্ছু জানে না। কাল বললাম কি? যাচ্ছি তো বংশীদাস বাবুর হাওয়া মহলে।'

বৃন্দার পিছনে পিছনে আর যারা এসেছিল তারা হাসল। কে যেন মুখে আঁচল দিয়ে বলল, 'ভদ্দর সমাজে যেতে দিদি কোনও দিনই ভালবাসে না। তার চেয়ে বরঞ্চ—' গোলকের দিকে চোখ ফিরিয়ে খিল খিল করে উঠল।

বৃন্দা জানে আসর মাৎ করতে হলে সৌদামিনীকে নিতান্ত প্রয়োজন। এবং আজকার আসরের একটা বিশেষত্বও আছে। পুরুষ গায়ক কেউ উপস্থিত থাকবে না। আজ বংশীদাসবাবু দান করবে মুক্ত হস্তে। এর মধ্যে বৃন্দা একা গিয়েও নাকি কিছু কিছু এনেছে। কিন্তু আজ যা দেবে তা গুণাগুণ বিচার করে। বংশীদাস-বাবু আছে বলেই দলের এত জৌলুস। নইলে শুধু বায়না গেয়ে আর দল রাখা যেত না। মানুষটির দুঃখের বিষয় চোখ গেছে কিন্তু মনটা তার তাজাই আছে। ক বার সে সৌদামিনীর কথা জিজ্ঞাসাও করেছে। 'তোকে এখনও ভোলেনি বোন। যদি—'

সৌদামিনী বলল, 'লোভই দেখাও আর জোরই কর—তুমি তো জান দিদি আমি তোমার মাইনে করা গাইন নই। বেশি জেদ করলে এখনি চলে যাব দল ছেড়ে।'

'থাক থাক বাপু, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি ভদ্দর সমাজে যাবে ক্যান, তার চেয়ে থাক নাপিত ধোপা নিয়ে।' বৃন্দা চলে গেল। দলবল চলল পিছে পিছে। গোলকও বেরিয়ে এলো ওদের সঙ্গে সঙ্গে।

নায়ে ঢুকল গদাই। 'বেশ বলেছ রাধাদিদি, বেশ বলেছ। তোমার ভয় কি, নাও রয়েছে আমার। যখন তুমি বলবে···এই এখনই বলে দেখনা···'

কোন জবাব দিল না সৌদামিনী। সে চেয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। উপেক্ষিত গদাই সৌদামিনীর দৃষ্টি অনুসরণ করে ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে এলো।

হাওয়ামহলে বসে কি দানধ্যান করেছিল অন্ধ বংশীদাসবাবু ও তার বন্ধুরা এবং এরা কি আনন্দ বিতরণ করেছিল তাদেরকে, তা বাইরের কেউ জানে না। কিন্তু গাইনরা ফিরে এসে শয্যাশায়ী হয়ে রইল সম্পূর্ণ একটা দিন ও রাত।

সৌদামিনীর আভিজাত্যে যে কঠিন আঘাত লাগল সেদিন, তার ঘা তীব্র জ্বালমুখী হয়ে রইল। মনে পড়ল তার ঐতিহ্যের কথা। কি সে ছিল এবং নামতে নামতে কোন্ স্তরে এসে পৌছেছে। ঐ গোলকটার জন্যই তার আজ এ দশা। ফেরার কোনও পথই তো সে দেখছে না। সুমুখে নিরানন্দ উষর জীবন। কোন ফল এ মাটিতে ফলবে না। কিন্তু এমন করে এখানে সে শিকড় গেড়েছে যে উঠে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। মানুষ খুশি হয় তার গান শুনে। অথচ যাওয়ার বেলা ঘৃণার চোখে তাকিয়ে দেখে গাইন বলে। আর যার জন্য আজ তার এ বৃত্তি গ্রহণ করা সেটা তো অমানুষ। সেদিন ওদের টিটকারীর পর্যন্ত একটা জবাব দিল না। বলতে পারল না যে প্রভুর নামে ধোপা নাপিত ভুঁইমালী সব এক হয়ে যায়। এমন যে বেশ্যা সেও হয় বৈষ্ণবী পৌছে যার মহিমার কোঠায়।

ওর মনই নেই, বলবে কি! আছে শুধু খেয়াল। এমন মানুষকেও সে ভালবাসল! সৌদামিনীর ইচ্ছা করল একা একা নায়ের তক্তায় কপাল কুটতে।

গদাই সৌদামিনীর মুখখানা ভার দেখে কোন কথা বলতে সাহস পেল না। সে সন্ধ্যাবেলা ওর রাধাদিদির শাড়ি দুখানা বাইরের ছই থেকে তুলে ধীরে ধীরে পাট করে এনে সাজিয়ে রাখল নায়ে।

আরতির জন্য ধূপ দীপ গুছিয়ে রাখল। তারপর দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

'কিছু বলবি গদাই ?'

'তুমি চুল বাঁধবে নি ? আজ দুদিন মাথায় কাঁকই দ্যাওনা, চুলের রাশে জট পাকালে তখন যে বড্ড মুস্কিলে পড়বে।'

'নিয়ে আয় আয়না চিরুণী। আমার কেমন জানি মনটা বিগড়ে গেছে। আর এখানে ভাল লাগছে না।'

শুধু আয়না চিরুণী নয়, আলতার শিশিটাও নিয়ে এলো গদাই পিছনের খোপ থেকে।

চকচকে কালো চুলে সূর্যের শেষ রক্তাভ রশ্মি কাঁপতে লাগল। সৌদামিনী চুল বাঁধছে নিজের হাতে। চেয়ে দেখছে গদাই। আর ওর মনে গান জন্মাতে চাইছে। যে গানে ললিত বর্ণনা রয়েছে এই মেঘবরণ কেশের এবং এই অপূর্ব রূপসী নারীর। এমন অনেক গানই শুনেছে গদাই, তবে তার এখন তা স্মরণ হচ্ছে না। কিন্তু মন তো ভরে উঠছে পুলকে। সে তন্ময় হয়ে থাকে।

'আমি আর এখানে থাকব না গদাই।'

'ক্যান, ক্যান, আবার সে কথা ক্যান ?'

'তোরা লোক ভাল না।' সৌদামিনী উঠে গেল।

কি অপরাধ করল সে ? কারা মন্দ মানুষ ? গদাইর মোটা মাথা ভরে গেল চিন্তায়।

সন্ধ্যা বন্দনা শেষ হলো সৌদামিনীর। গদাই শুধু ভাবছে। খেই পাচ্ছে না কিছুই। এ যে বড় জটিল সুতো।

রাত্রে গদাই বলল, 'তুমি গেলে, আমিও যাব তোমার সাথে।'

'মাইনে পাবি নে। বার মাস বিনে মাইনায় নাও বাইতে পারবি ?'

বার বছরও সে রাজি—রাজি সারা জীবন। কিন্তু অক্ষরে উচ্চারণ করে কিছু বলতে পারল না। রইল মুখ বিকৃত করে চেয়ে।

'গদাই, গোলক কোথায় ? ঐটা যদি মানুষ হতো...'

তবে বুঝি ওর রাধাদিদি যেতে চাইত না দল ছেড়ে। গদাই

সংকল্প করল: গোলককে ডেকে বুঝিয়ে বলবে একটু ওর দিদির মনের মত হয়ে চলতে। এমন আর কঠিন কি সে কাজ? নাও বাওয়া, খন্তা চালান, কুড়োল কোপান,—যা করে গদাই সন্তুষ্ট রাখে বৃন্দাকে, তার চেয়ে কত সহজ সৌদামিনীর মন রাখা। একখানি দুখানি শাড়ি ধুয়ে পাট করে তোলা, হয়ত দাঁতের মাজন তেল গামছা এগিয়ে দেওয়া—এ আর একটা কাজ! তবে তার কাছে থাকতে হলে চলতে হবে একটু ছিমছাম পয়-পরিষ্কার হয়ে। গদাই তো তেমনি ভাবেই চলে। গোলক কি তা পারবে না?

গোলকের চালচলন স্বভাব চরিত্র কিছুই পছন্দসই নয়। গদাইর চোখ জ্বলে ওকে দেখলে, তবু গদাই একবার অনুরোধ করবে, বলবে মনের মত হয়ে চলতে।

রাধাদিদি ভালবাসে গোলককে। কেমন একটা অব্যক্ত দাহে বুকটা পুনরায় জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। গদাই নাও ছেড়ে নদীর পারে ওঠে।

'ও কি গদাই যাস কই?'

'যাই গোলককে ডাকতে।'

'সে বৃন্দা দিদির নায়ে নয়?'

'না, গেছে হরিৎগঞ্জ মেলা দেখতে।'

'না বলে কয়ে!'

'তুমি ভেবনি রাধাদিদি, আবার রাগ করে চলে যেওনা কোথাও, আমি এলাম বলে ওকে ডেকে নিয়ে।'

'সে যে পাঁচ কোষ পথ, বড় খাল রয়েছে দুটো।'

'হনুমানের মত আমি বায়ুতে ভর করে যাব আর আসব। আমি ওকে ল্যাজে বেঁধে আনব।' গদাই মাথায় গামছা বেঁধে দুমদুম করে পা ফেলে এগিয়ে যায়।

তবু অন্তর ওর ধিকি ধিকি করে জ্বলে। ও বলে, 'মনরে কেউ পেয়ে সুখী, কেউ দিয়ে সুখী—তুই আয়রে শেষের দলে।' গদাই প্রবোধ দেয় আর এগিয়ে চলে সমুখে।

তের

সৌদামিনীর বিরূপ মন আরও তিক্ত হয়ে উঠল আর একটা ঘটনায়। সে ভাবল, গোলক যখন মেলায় গেছে তখন নিশ্চয়ই খালি হাতে যায়নি। সৌদামিনীর ঠাকুরের তহবিলে ছিল কটা টাকা। রেখেছিল সাবধান করে নায়ের জল খোপের পাশে একটা রাঙা বাঁশের ঝাঁপিতে। সে তক্তার পাটাতন তুলে দেখল টাকা তো নেই, ঝাঁপিটাও উধাও হয়েছে। কিছুক্ষণ খোঁজার পর ঝাঁপিটা অবশ্য পাওয়া গেল মাল-খোপে। তার ভিতরে রয়েছে সেই সেদিনের থলেটা। সৌদামিনী আলোটা উস্কে দিয়ে থলেটা তুলে আনল। মুখ খুলতেই সৌদামিনীর গা-হাত-পা জ্বলতে লাগল। এত দুঃসাহস! তার ঠাকুরের ঝাঁপিতে গাঁজার কল্কি! কল্কিটা শ্বেত পাথরের, নিঃসন্দেহে সৌখিন বস্তু। কিন্তু সৌদামিনী কল্কির সঙ্গে গাঁজা কাটা ধারাল ছুরিখানা পর্যন্ত নদীর জলে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিটা পরিষ্কার করে মাথায় ঠেকাল। এই কল্কিটাই সেদিন গোলক কিনেছিল এক টাকায়। কায়েমী জিনিস, এক পুরুষে নষ্ট হবে না সযত্নে রাখলে! সৌদামিনীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিড় খেয়ে গেল।

পরদিন বায়না আছে। সৌদামিনীর কাছে বৃন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'গোলক কোথায়?'

সৌদামিনী জবাব দিল, 'মরেছে।'

'মরছে বললেই হলো? মরতে হবে পালা গেয়ে। চুক্তি করে ফুরনের টাকা আগাম নিয়ে গান না গেয়ে মরলে যম দুয়ার থেকেও টেনে আনব আমি। আমার নাম বিন্দে!'

'তা আনবে আনবে, আমাকে শুনিয়ে লাভ?'

'একটু আছে বই কি, নইলে বলি!'

বৃন্দা কঠোর বটে কিন্তু সে যে এতটা রূঢ়-ভাষিণী হতে পারে তা সৌদামিনী জানত না। 'ও আমার দু'চোখের বিষ, এখন পেলে ওকে আচ্ছা করে খ্যাংরা-পেটা করতাম। তবুও তুমি খোঁটা দিচ্ছ আমাকে? দিদি সব চিনলে মানুষ চিনলে না!' সৌদামিনী বৃন্দার সুমুখ থেকে চলে এলো চোখে আঁচল চেপে।

'বিন্দের কিছু চিনতে বাকি নেই—সে আর যা-ই করুক বাঁদর নিয়ে নাচে না।' তারপর অজস্র অভিশাপ ও গালি বর্ষণ করতে লাগল বৃন্দা। ওকে নাকি আস্কারা দিয়ে দিয়েই মাথা খেয়েছে সৌদামিনী। রাতারাতি ফেরার কথা গদাইর, সেও বাদ গেল না।

সৌদামিনী চুপ করে শুনল। যেন বাধ্য হয়ে গিলল তেতো ওষুধ। বৃন্দার বাড়াবাড়ির মাত্রা একটু জানি কেন বেশী বলেই মনে হলো তার।

সন্ধ্যা বেলা পর্যন্ত গদাই ও গোলক ফিরল না। এবার সৌদামিনী বুঝল এমন কিছু অন্যায় বলেনি বৃন্দা। আসরে ঐ আলো জ্বলন, মানুষ আসছে চারদিক থেকে, মূল গায়ক নেই। একটু পরেই বাজতে শুরু করবে ঐক্যতান। আজ সকলের মাথা কাটা যাবে ঐ বাউণ্ডুলে ভূতটার জন্য। আর গেল যে হনুমানটা খোঁজে, সেটারই বা হলো কি?

পালা জমুক কি নাই জমুক বায়না যখন নেওয়া হয়েছে তখন গাইতেই হবে গান।

সৌদামিনী সাজতে গেল। অন্যান্য মেয়েরাও সেজে প্রস্তুত হোলো। একখানা বাজে গান নিয়ে সবাই ঢুকল আসরে। লোক হয়েছে যথেষ্ট—গান চলল অনেকক্ষণ।

এখন যে কৃষ্ণের প্রয়োজন।

আসরের বাইরে এসে বৃন্দা হয়ত মাথা ঠুকে মরতে চাইত। কিন্তু এমন সময় পীত বাস পীত উত্তরীয় পরে আসরে ঢুকল গোলক। তাকে দেখে বৃন্দার পিত্ত জ্বলে গেল। সে মনে মনে গোলকের মুড়িঘণ্ট রেঁধে খেল শত সহস্রবার।

অথচ কি আশ্চর্য, তাকে দেখে সভা উঠল উল্লাসে নেচে। ঢুলি

বাইন, গাইন তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ছন্দ মিলাতে লাগল। গদাই হাসছে রাধার দিকে চেয়ে।

মাতাল হয়ে পড়েছিল গোলক মেলার এক হোগলা ঘেরা নোংরা বেশ্যা বাড়ি। গদাই তাকে অনেক মেহনৎ করে তুলে নিয়ে এসেছে ; ঠিক হনুমানের মত। সে কথা কেউ শুনল না। শুনতে লাগল গোলকের অদ্ভুত মন-মাতান মিষ্টি কণ্ঠ। জমতে লাগল গান। রাধা ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

এ তো মানুষের বা মাতালের কণ্ঠ নয়, কণ্ঠ স্বর্গের। ঐ চোখ তো গাঁজাখোর গোলকের নয়—ও যে পদ্মপলাশ লোচন! চরণে ওর নূপুর বাজে আধা-আধা—কোথায় রাধা, রাধা গো ?

সভা নির্বাক! যেন এতগুলো নিরক্ষর এবং অর্ধশিক্ষিত লোক চলে গেছে মেঘলোক পেরিয়ে কোন এক অতীন্দ্রিয় মধুময় রাজ্যে। যেখানে একা গোলকরূপী কৃষ্ণ শুধু পুরুষ, আর সবাই ভাব বিধুরা নারী! রস, রূপ ও মাধুরী যেন গলে গলে পড়ছে সারা আকাশ বেয়ে। চেয়ে রয়েছে চন্দ্র তারা।

রাত্রে সব কথা ভুলে আবার সৌদামিনী গোলকেরই সঙ্গে পরামর্শ করল, নতুন ঘর বাঁধার।

কান খাড়া করে গদাই শুনল সব। বুকের একটা অস্বস্তিকর টিপ-টিপানি চেপে মনে মনে বলল, 'আহা ওরা সুখী হক, আহা ওরা সুখী হক!'

'গোলক তুই কে তা জানিস ?'

সৌদামিনীর এ অভিনব প্রশ্নে গোলক অবাক হয়ে রইল। সে তো এক নাপিতের ছেলে। তা কি ও জানে না ? 'আমি—আমি তো—'

'তা নয়রে। তুই কৃষ্ণের অংশ, তুই পুরুষ। আর আমি প্রকৃতি, রাধার অংশ। আমরা বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবী। তুই নিজেকে অত ছোট মনে করিস ? রূপের কথা নয়, বংশের কথা নয়, কালো কুচ্ছিতেরও কথা নয়—এখানে কথা হচ্ছে গুণের। পুরুষ মাত্রেই গুণী, নারী মাত্রেই সুন্দরী।'

এতদিন এই কীর্তনের দলে থেকে নানা পর্যালোচনার ভিতর দিয়ে রাধা যে স্তরে এসে পৌঁছেছে, ও গোলককে সেখানে হাত ধরে টেনে তুলতে চায়। দেখাতে চায় যে সাধারণ মানদণ্ডের অন্তরালেও একটা সূক্ষ্ম মানদণ্ড রয়েছে—যা সর্বদা খোলা চোখে নজরে পড়ে না মানুষের।

গদাই বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলে গলুইতেই শুয়ে আছে। সেও সব মন দিয়ে শুনছে। সমস্ত না বুঝলেও কতক যা বুঝেছে তাতেই সে অধীর হয়ে ভাবছে—সুন্দর কুৎসিতের কথা নয় যখন তখন তারও তো একটা দাবী আছে। কিন্তু সে কথা তো বলছে না রাধা। রাধা গোলকের জন্য তন্ময়। 'ওরে মন তুই তো শুধু মাঝি, পার করে দে হাটুরে নরনারী। তোর নজর কেন সুন্দরী মেয়েমানুষের ওপর?'

'রাধা তুই বাস্তবিকই সুন্দরী।'

'হায়রে নেশাখোর, এতদিন বাদে বুঝি তুই তা দেখলি!' মন্তব্য করল গদাই বাহির থেকে মনে মনে।

রাধা বলল, 'এখন তোর বাজে কথা রাখ গোলক।'

'বলো বলো রাধাদিদি দেহতত্ত্বের কথাই বলো, তোমার মুখে তা শুনি—বড় ভাল লাগছে শুনতে।' মনে মনে বলে গদাই নিশ্বাস বন্ধ করে রইল উত্তরের জন্য।

'আমরা বৈষ্ণব, আমরা হিংসে করব না, আহারে-বিহারে আমাদের থাকবে সংযম। দিনান্তে একবার শুধু খাব নিরামিষ।'

'সে তো ভাল কথা রাধাঠাকুরাণী, সে তো ধম্ম কথা। কিন্তু তার মম্ম কি বুঝবে ও?'

'মদ মাংস সিদ্ধি গাঁজা বৈষ্ণবের ছোঁয়া নিষেধ।'

'কার কাছে বলছ এ কথা? ধেনো মদ গাঁজা দেখলে ও কি পারবে লোভ সামলাতে? চোরের কাছে শাস্তর ব্যাখ্যা! তুমি কিছু বুঝলে না রাধাদিদি, বেনোবনে খালি খালি মুক্তো ছড়ালে।' একটা নিশ্বাস ছাড়ল গদাই।

'ও কি তুই ঘুমোস নি?' সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করল গদাইর উসখুসানি শুনে।

গদাই জবাব দিল, 'না।'

'আমি বোঝাচ্ছিলাম গোলককে।' লজ্জাটা ঢাকার জন্য এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারল না সৌদামিনী।

'ও কতদূর বুঝল—না বেবাক তোমার জলে গেল রাধাদিদি?'

গোলক ঝিমাচ্ছিল। সে চোখ মেলে জবাব দিয়ে উঠল, 'এর মধ্যে আর না বোঝার কি আছে? একটু ফুর্তি-টুর্তি করতাম, তা আজ থেকে নিষেধ হয়ে গেল। না-ই বা খেলাম গাঁজা-মদ, তাতে কি আর দিন যাবে না?'

এক রকম প্রতিজ্ঞা করল বটে গোলক, তাতে সৌদামিনীর মন ঠিক ভরল না।

গদাই উঠল হেসে।

বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়ল গোলক।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। এখন যেন বেশ একটা ঠাণ্ডা লাগছে শিরশিরে। খালের জলো হাওয়ায় যেন একটা আমেজ ছড়াচ্ছে। গদাইর চোখ তন্দ্রালু হয়ে এলো। শব্দ নেই, কথা নেই, যদিও বা একটু ব্যথা থাকে কোথায়ও—তার ওপরও পড়ল ঘুমের প্রলেপ। চুপ করেছে সৌদামিনী ও গোলক।

ঘুম এলো জলে, নায়ে, সারা পৃথিবীতে।

গোলক ঘুমের ঘোরেই বুঝি সৌদামিনীকে আরও কাছে টানল। সৌদামিনী এগিয়ে এলো নীরবে। যেন আবার ওরা অভিনয় করছে, পালা শেষ হয়নি এখনও, চলছে দুঃখ, বিরহের সংঘাত। অভিনয়ে যা পূর্ণ হয়নি, এবার বাস্তবে তা পূর্ণতা লাভ করতে চলল। মুছে গেল দুজনার ব্যবধান, ভুলে গেল সৌদামিনী তার কৈশোরের নিষ্ফল ঐতিহ্য। এখন তার আর অহংকারও রইল না বৈষ্ণবের। দেহের দুয়ারে অমিয় ক্ষরিত হতে লাগল। দুজনের ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় জন্ম নিল এক মহান আনন্দ।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ল কৃষ্ণ ও রাধা।

চৌদ্দ

বছর শেষ হয়ে এলো। পঞ্জিকার বছর নয়, গানের। আকাশে দেখা দিল পাতলা লঘু মেঘ। বর্ষা আসন্ন। বৃন্দা এখন দিনের ভিতর দুটো বায়নাও ধরে। দল ভাঙার সময় এলো, এবার যতটা এদের খাটিয়ে আয় করে রাখা যায়।

'আমি কিন্তু আর আমিষ খাব না। দুবেলা খাটতে হলে ঘি দুধ চাই।'

'সাধুর এত লোভ!' হেসে ফেলল অন্নদা। গানের বছর ফুরিয়ে এসেছে দলের, আর বয়সের বছর ফুরিয়ে এসেছে অন্নদার। তবু তা ধরা যায় না। ঢাকা থাকে হাস্যে লাস্যে ও ক্ষণবিদ্যুৎ চাহনিতে।

অপ্রতিভ গোলক ভাবল, নেশা-টেশা করে কেবল চানাভাজা খেয়েও নামিয়ে দেওয়া যায় একটা পালা। কেবল নিরামিষ খেয়ে বৈষ্ণব সেজে চলা তার পক্ষে তো সহজ নয়। অথচ ঘাড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কি এক আকস্মিক বিপদ!

হাজার অনিচ্ছা থাকলেও সে স্নানের সময় ভয়ে ভয়ে গাঙের মাটি তুলল। চন্দনের বদলে ফোঁটা কাটবে মৃত্তিকার। কপালে দীর্ঘ করে টেনে দিল একটা রেখা।

ভিজা কাপড়ে অমনি মুখ বেঁকিয়ে একটু হেসে কূলে উঠল অন্নদা। বোঝা গেল প্রমত্তা নদী এখনও তার চঞ্চলতা হারায়নি! ইচ্ছা করলেই ভাঙন ধরাতে পারে সুউচ্চ যে কোন সুদৃঢ় তটের বুকে।

মাটি ফেলে গোলক ওপরে উঠল। মুস্কিলে পড়ল সে। আমিষেও দোষ, নিরামিষেও দোষ। পথ দুটো, তার কোন্‌টা

ধরবে? খুশি রাখবে কাকে? সৌদামিনীর কাছে গিয়ে আবার মনের এই দ্বন্দ্ব জানাবে নাকি গোলক? তার তো ইচ্ছা ছিল, একটা জেদও হয়েছিল শুচিশুদ্ধ মত চলতে। বিশেষ করে গদাইর জন্যই ওর ভয়। এক্ষুণি বলবে, রাধাদিদি তোমার গোলক—না, একথা সহ্য করা যাবে না। ও পবিত্র হয়েই চলবে। নেশা ভাঙ করে ও তো কতই দেখেছে। এবার কেবল কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণকথা আর সবই মিথ্যা।

এমনি করেই সমস্যা মীমাংসা করল গোলক। সেদিন সে মাছ মাংস না খেয়ে তরি-তরকারী খেল এক গাদা। ওড়াল নতুন আতপের গন্ধমাদন। ঢেকুর তুলল ঘন ঘন।

আজ সারারাত গান চলবে। কারণ পালা ধরা হয়েছে বেশি রাত্রে। দিনের বেলাও আজ বন্ধ রয়নি বায়না গাওয়া। মঞ্জিলপুরের আসর ভেঙেছে বেলা মাত্র প্রহর খানেক থাকতে।

ভোরের দিকে চোরের মত অন্নদা এসে দাঁড়াল এক গাছতলায়। আবছা আবছা আঁধার তখনও আছে। একটু দূরে আসর। মানুষের ভিড় সেখানেই। অন্নদার গায় একটা উড়নী, মুখে এখনও রঙের প্রলেপ।

কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণ বেরিয়ে এলো আসর ছেড়ে। পীত বসনে পড়ল পিছন থেকে টান। অমনি হেসে চাইল গোলক। 'আমি সেরে এলাম।···কিন্তু মাইরি বড্ড চোঁয়া ঢেকুর উঠছে।'

অন্নদা বলল, 'প্রাণবল্লভ ওষুধ আছে।'

দুজনে এগিয়ে গেল ঝাঁকড়া নিমগাছটার দিকে। ভোরের আকাশে তখন চাপ বাঁধা মেঘ করেছে আগত বর্ষার। চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ—হয়ত এখনি বৃষ্টি নামবে।

বছর শেষ হয়েছে, কিন্তু বয়সের রেশ শেষ হয়নি অন্নদার। সে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল গোলককে।

রাধা তখন বিলাপ করছিল আসরে।

ভোরবেলা নায়ে ফিরে গোলক ঘুমিয়ে পড়ল একটা চটের থলের ওপর। ঘুম ভাঙল দুপুরে। তার বড় অনুশোচনা হলো। আহা সে কি করতে কি করল! চট করে এমন অসংযত হওয়ার জন্য গ্লানিও জন্মাল খুব। সে না গেল অন্নদার কাছে, না খোঁজ নিল সৌদামিনীর। রইল একটু দূরে দূরে।

আজ থেকে সে আর ওপথে পা দেবে-না—কিছুতেই নয়। প্রতিজ্ঞা করল তিনবার, মনে মনে কানমলা খেল একশবার। ছোট-বেলার গুরুমশাইকে স্মরণ করে নাকে খতও খেল বার দুয়েক। তারপর সে স্নান করতে গেল এবং খেতে বসে যথারীতি আতপ অন্নের গন্ধমাদন ওড়াল। সকলে অবাক হয়ে দেখল গোলকের এই অভাবনীয় পরিবর্তন।

খুশি হলো সৌদামিনী। এই তো হাতে খড়ি, এর পর প্রথম ভাগ, তারপর যুক্তাক্ষর। পারবে, গোলক নিশ্চয় পারবে প্রভুর পদে চিত্ত মন বিলিয়ে দিতে।

'গোলক, কষ্ট হচ্ছে ?'

'না গো আনন্দ পাচ্ছি।'

'এরপর নিত্যানন্দের সন্ধান পাবি।'

'আমি তো চাইও তাকে—ও কলকাতায় এক কারখানায় কাজ করত। তারপর চুরি করে ফেরারী হয়। বলেছিল আমায় কলকাতা নিয়ে যাবে।' একবার সেখানে যেতে পারলে মাইরি তোকে আর কি বলব সৌদামিনী, আর নাকি রাত জেগে এমন বিন্দের ঠেলা খেয়ে পালা গাইতে হতো না। কী আজব সহর কলকাতা। নিত্যানন্দ বললে নাকি আমার কথা কিছু ? দেখা হলো কোথায় ?'

'চুলোয় !' বলে গোলকের উচ্ছ্বাসটা একেবারে নিবৃত্তি করে দিয়ে চলে গেল সৌদামিনী ঠাকুরের পটের কাছে।

'ঠাকুর ওকে ক্ষমা করো। ও অবুঝ নির্বোধ, ধীরে ধীরে সুবোধ হবে তোমার দয়ায়।'

প্রার্থনারতা সৌদামিনীকে দূর থেকে দেখল গোলক। কিন্তু তার

কাছে এগিয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না তার। সত্যিই নিত্যানন্দ ছোঁড়াটার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছিল হরিৎগঞ্জে বসে!

অন্নদা পাশ কাটিয়ে গেল, ইচ্ছা ছিল মন টলিয়ে যাওয়ার—ভয় পেল সৌদামিনীকে দেখে।

পরিষ্কার নীল আকাশে মেঘ ছুটছে দল বেঁধে। বর্ষা এলো দক্ষিণা মৌসুমী হাওয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। একবার ছায়া পড়ছে জলে স্থলে। এমন যে গানের ক্ষুদ্র নায়ের বহর, তার ওপরও—আবার আলো হাসছে। ছায়া ও আঁধারের মায়ায় এগিয়ে চলছে বৃন্দার গানের দল। কত নদ নদীর শাখা প্রশাখা দিয়ে যে ভেসে যাচ্ছে সংগীত! পালাগানের বছর শেষ হলো বলে। তাই দেশদেশান্তরে আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে প্রেম ও আনন্দধ্বনি। বৃন্দা আর কিছু জানে না—পানাহারও তার কমেছে—সে শুধু বায়না ধরতে ব্যাকুল। গান, গান, আরও যত পালা সে গাইতে পারে!

'কি বললি অন্নদা?'

'এই দেখ হাত-চিঠি, নইলে তুমি তো বিশ্বাস করবে না। মার ব্যামো খুব বেশি—দুটো দিনের জন্য ছুটি চাই।'

'হবে না। আর বড় জোর একটা হপ্তা, এর মধ্যে বাদলা নামবে। একদিনে আর তোর মা মরবে না।'

'বলো কি, এখন-তখন!'

'বছরের শেষ মুখে অমন এখন-তখন হয় অনেকের মা।'

'তুমি বললে কী দিদি!' অন্নদা আর একটু কাছে এগিয়ে আসে। 'তোমার কি মা বাপ ছিল না?'

'পায় হাত দিও না বোন, এখন কিছুতেই ছুটি হবে না।'

'আমি থাকব না।'

'যাও। একটি পয়সাও পাবে না।' হাসে বৃন্দা।

'তুমি হাসছ? তুমি একটা কী বল তো?'

'আমি আর কিছু নয়—শুধু তোমাদের অন্নদাত্রী—'

বৃন্দার কথায় অন্নদার চোখের জলও শুকিয়ে যায়। বলার মত কোন কথা তার মুখে জোগায় না।

'তুমি আবার কি চাও শানদার?' মুখ ফিরিয়ে বৃন্দা জিজ্ঞাসা করে।

'সবই তো জান তুমি—'

'জানি তো সবই, কেবল এই সাতটা দিন কিছু ভাবতে পারছি নে। এ বছরের মনে দল ভেঙে হরিবোল দিয়ে তখন সব ভাবব।'

'বৌটা—'

'মরবে না। মনে জোর নেই ক্যান? মিছামিছিই এতদিন শ্রীখোল বাজাচ্ছ। একটু ভক্তিমান হয়ে তাঁর ওপর নিভ্‌ভর করো।' উপদেশ দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৃন্দা।

শানদার মাথা নত করে চলে গেল। বৃন্দা পোষাকের নায়ে কি যেন খুঁজতে গেল।

একটা জটলা হতে লাগল। কি অন্যায়! শানদার ঢুলি আরও কজন এগিয়ে এলো। কেউ দিল প্রবোধ, কেউ বা জুগিয়ে দিল ইন্ধন। কিন্তু সবই নীচু গলায়। বোঝা গেল প্রায় প্রত্যেকেরই মনে একটা অসন্তোষ ফেনান রয়েছে।

দলের ভিতর সারাদিন এই আলোচনাই চলল। বৃন্দা সকলের মুখভার দেখে একটা কিছু অনুমান করে নিল।

সন্ধ্যার পর সকলকে ডেকে বলল, 'আমি তোমাদের অন্নদাত্রী কিনা?'

'হ্যাঁ, তাতো কেউ ভুলেও অস্বীকার করে না।'

'তবে জটলা করছ ক্যান? জানো, যে অন্ন জোগায় তাকে সময়তে কড়া না হলে চলে না?'

সকলে চুপ করে শুনতে লাগল।

'আমি পাষাণ নই, কিন্তু যে টাকা জোগায় সে পাষাণেরও বাড়া। তোমরা সবাই ভাল করেই জান যে, শুধু পালা গেয়ে আর দল চলে

না। মাইনের ফিল-ফাজিল ভাঙতে প্রিতিবার আমার হাড়মাস থেতলে যায়। অন্নদাও ভুক্তভোগী—তবে? ও ন্যাকামি করছে ক্যান খামাখা?'

দলের মেয়েরা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে—পুরুষরা উঠে যায়।

'মা মরুক, বৌ মরুক, ঘরে আগুন্ লাগুক, তোমরা আমাকে আর এ কটা দিন জ্বালিও না, ···ও গদাই, তোদের খাওয়া হলো, এখনি যে জোয়ার আসবে। নাও খুলবি নে?'

মালতী বলল, 'অন্নদা, মরার হলে মা তোর মরবেই—এই তো আর কটা দিন!'

অন্নদা সব বুঝেও যেন ঠিক শান্ত হতে পারল না!

পনর

দেখতে দেখতে দিন কটা সত্যিই কেটে গেল। আজ পালা গাওয়ার শেষ দিন। এরপর হিসেব-নিকেশ, তারপরই বিদায়। বাড়ি যাবে সকলে, সেই উৎসাহে শেষের পালা সাধারণত জমে ভাল, এবং বেছে বেছে যে কোনও একটা নাম করা বাড়িতে কিম্বা গঞ্জেই এ পালা গাওয়া হয়—যেখানে কোন আশঙ্কা থাকে না টাকা পয়সা নিয়ে গোলমালের।

এবার পালা সাঙ্গ হবে শ্রীমানকাঠি এক ভূঁইমালী বাড়ি। অবস্থা এদের বিরাট। আগে নাকি এরা ফুল জোগাত এক রাজবাড়ি। রাজা দান করে গিয়েছিল চাকরান বিত্ত। সে বিত্তের বার আনি তখন ছিল জল আর জঙ্গল। এখন সেখানে নাকি হয় প্রচুর ধান, আমন এবং আউশ।

তারা গদাইকে নিয়ে হাটে গেল। যাবে একটু দূরে, আনবে প্রচুর জিনিসপত্র কিনে। ভোজ দেবে গাইনদের।

কর্তারা নাও থেকে নেমে কচু এবং কুমড়ো হাটা যাওয়ার বন্দেজ করে তুজনে, আর মাছের বাজারের দিকে একজন।

'গণেশ, কচু কিনব ক কুড়ি? কুমড়ো?'

'এই কুড়ি পাঁচেক।'

'নায়ে ধরবে নি?'

গদাই চেঁচিয়ে ওঠল, 'অত কচু দিয়ে হবে কি?'

'বল কি এই কটা আনাজ! গাইনেরাই তো পাঁচজন—খায় নিরেমিষ।'

'তা বলে কচু খাবে না কেউ।'

'ওরে ভোলা, ফের ফের, গাইনেরা নাকি কচু খায় না—ওরে এমন

নয়ালী আনাজ পছন্দ করে না। ও ভোলা ফের ফের।' পয়সা নষ্ট হওয়ার ভয়ে বুড়ো রামেশ্বর ভুঁইমালী ছুটে যায়।

গদাই বলল, 'একটা কথা। বেসাতি পরে হবে, আগে ঢ্যাঁরা পিটিয়ে দাও মশাই, যে সৌদামিনী গাইন সাজবে নিমাই—আজ শেষ রজনী। পালা হবে নিমাই সন্ন্যাস।'

'ঠিক বলেছ তুমি। আগের কাজ আগে।'

কেরোসিনের তেলের একটা খালি টিন এলো। গাছে উঠে একটা শক্ত ডাল ভাঙল একজন। এবার বাজাতে বাজাতে চলল হাটের ভিতর। 'নিমাই সন্ন্যাস পালা, গান হবে শ্রীমান-কাঠি। সৌদামিনী গাইন সাজবে নিমাই, আজ শেষ রজনী, আজ শেষ রজনী!' তারপর ঘন ঘন শব্দ।

যারা ভাল করে শুনতে পেল না তারা ভাবল বুঝি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে নদীর কোন 'উঠতি' চর। এসেছে খাসমহলের ডেপুটী। অবশেষে তাদেরও ভুল ভাঙল। 'জমি নয়, পুরুষ সাজবেন জেনানা গাইন—ওরে লিমাই সন্ন্যাস হবে।' একটা সাড়া পড়ে গেল সারা হাটে।

হাটের এক প্রান্তে একটা পাঁকুড় গাছের তলে নাও বাঁধা ছিল গদাইর। তার পাশেই একটা সাঁকো। সাঁকোটা পেরিয়ে একজন এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি গানের দলের মাঝি?'

'হেঁ।'

'একি সেই সৌদামিনী, যে সেবার গান গেয়েছিল হরিৎগঞ্জ হাটের বার-চালায়?'

'হেঁ—তোমার দরকার?'

'আমি তার গান শুনব, অনেকদিন ধরে খুঁজছি তাকে।'

'তুমি কে? তোমাকে যেন চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে। সে দিন সে বার-চালায় আমিও ছিলাম। তুমি আমার পাশে ছিলে নাকি? কিন্তু তোমার বসন-ভূষণ দেখে তো ঠিক বুঝতে পারছিনে আজ। গেরুয়া আলখাল্লা পরেছ ক্যান? তোমার গায় আতরের গন্ধ কই? দরবেশ হলে নাকি এই বয়েসে?'

'তুমিই না আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিলে হরিবোল বোলে? ঠিক তুমিই তো। বেশ হলো দেখা হয়ে। আমি ভাই সেই থেকে খুঁজছি, কিন্তু এমন বরাত, দেখা পাচ্ছিনে তোমাদের গাইনের। আহা কি গানই গেয়েছিল সেদিন, জীবনে অমন গান আর শুনিনি!'

'ইচ্ছা করলে আজ শুনতে পার—সেই পালাই গাইবে, নিমাই সাজবে সৌদামিনী।'

কেবলমাত্র গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে! টকটক করছে রং কাঁচা হলুদের মত, তার ওপর গেরুয়া বাস। যেন সদ্য এক রাজপুত্র গ্রহণ করেছে সন্ন্যাস; মনে হচ্ছে যেন ছাই চাপা আগুন।

'এ নবীন বয়েসে তোমার এ খেয়াল হলো ক্যান?'

'সে কথা আর শুনে কি করবে? ছিলাম কলুর ছেলে, বাপের নাম এলাহি খন্দকার, আমার নাম মহব্বৎ, করতাম ভাই তেলের ব্যাপার। বড় ভেজাল, আর ভাল লাগল না ও সব কাজ! গান শুনে মন গেল খারাপ হয়ে—তোমাদের গাইনের গান।'

'তারপর?'

মহব্বৎ একখানা হেতেল কাঠের তেল কুচকুচে কালো রংয়ের লাঠি নৌকার ওপর রেখে বসল। সঙ্গের গেরুয়া ঝুলিটা রাখল নামিয়ে।

'তারপর?'

'এক জারীর দলে গিয়ে ঢুকলাম। বয়াতি (অধিকারী) পর্যন্ত হলাম, কিন্তু মন ভরল না। গালাগালি পাল্লাগানে আমি জুত পেলাম না।'

'তুমি সাধু। তোমার ও সব ভাল লাগবে ক্যান?'

'সেই থেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি—গাইন আমায় পাগল করেছে। আমি পথের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে ওখানে। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে যাব অনেক দূর। তার আগে ভাবছিলাম যদি আর একবার সেই গাইনের গান শুনে যেতে পারতাম।'

'পারবে দরবেশ, তোমার মনের ইচ্ছে পুন্ন করবে গোসাই। আমার সঙ্গেই চলো। আমি গানের দলের নেয়ে।'

গদাই তামাক সেজে অনুরোধ করল। মহব্বৎ হাত জোড় করে তা ফেরৎ দিল। বলল, 'ঢের খেয়েছি আর নয়। এখন ছেড়ে দিয়েছি ও-সব।'

গদাই মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল এই নবীন দরবেশের মুখের দিকে। তামাক, তাও যে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে এই বয়সে তার কাছে সংসার ত্যাগ করা আর কঠিন কি। 'ভাই, আমি তোমায় নাম ধরে ডাকব নি—ডাকব দরবেশ বলে। কি বলো, দোষ হবে?'

'তুমি খুশি হলে আর দোষ কি। কিন্তু আমি যে এখনও ও নামের যোগ্য হইনি!'

'কে এ কথা বলে? বলুক তো আমার সামনে। তুমি তামাক পর্যন্ত ত্যাগ করেছ। তুমি মহাজন হয়েছ। আমি গানের নায়ের মাঝি হলে কি হয়—বুঝি ভাব-বিবেকের কথা।'

দরবেশের মুখ বিকশিত হয়ে ওঠে। তপ্ত রংয়ে ঝিলিক মারে কৌমার্যের দ্যুতি।

দরবেশের মুখের দিকে চেয়ে থাকে গদাই। কত লোকই তো গান শোনে সৌদামিনীর—শুনেছে পয়সাওয়ালা কেতা-দুরস্ত বংশীদাসবাবু পর্যন্ত, কিন্তু কি বুঝেছে সে? হায়রে হাওয়া মহলের বাবু! দেখলে রূপ, খুঁজলে না গভীরে নেমে অরূপ রতন? জাগল কামনা, ফুটল না ঐ পাপ চোখ দুটো?

বংশীদাসবাবুর মত অভিশপ্তের জন্য আজ অনুতপ্ত হয়ে ওঠে গদাই।

হাটুরেদের হাট করা হয়ে গেছে। গাইনেরা কচু না খেলেও কিছু নয়ালী কচু না কিনে ছাড়ল না ভোলা। হঠাৎ যদি প্রয়োজন হয়; যদি আনাজে কম পড়ে। তা হলে সব আয়োজন হবে পণ্ড। গাইনেরা তো সংখ্যায় কম নয়।

একজন কূলে যায়, একজন নায়ে আসে, আর বলে, আমার তো

হয়েছে, অমুকে কই, আবার সে পাড়ে ওঠে—এমনি করতে করতে রাত হয় হাটে বসেই। গদাই বিরক্ত হয়ে বলে, 'রাঁধবে কখন ?'

এবার কর্তাদের খেয়ালের সুতোয় টান পড়ে। 'তাইতো, তাইতো।' বুড়ো রামেশ্বর নায়ে উঠে জুত্ করে বসতে পারে না কচুর কসের ভয়ে—সে রেগে ওঠে রাজেন ও ভোলার ওপর। ভোলার ওপরই অবশ্য চোটটা পড়ে বেশী। তবে সে ছইয়ের বাইরে গিয়ে লগি ঠেলতে আরম্ভ করে অন্যমনস্ক হয়ে। নৌকা চলছে জাহাজের মত শব্দ করে গাঙ তোলপাড় করে।

গেরুয়া সামিয়ানার তলে আজ ডেলাইট জ্বলছে পাঁচটা। দূর থেকে অন্ধকারে আলো দেখা যাচ্ছে নদীর প্রায় একবাঁক উজান থেকে। আকাশে কিছু যেন মেঘের সঞ্চার হয়েছে, তাই অন্যান্য দিনের চেয়ে উজ্জ্বল মনে হচ্ছে আলো। বাজনা শোনা যাচ্ছে আসরের। নায়ে উঠে যারা লগি বৈঠা মেরে সাহায্য করছিল গদাইর, তারা ঝিমিয়ে পড়ল ক্রমে। সারাদিন তো কম পরিশ্রম করেনি। এই বাঁকটা সোজা একটানা অথচ পথের অর্ধেকই এটার দূরত্ব। দিনের বেলা ধুধু করে, রাত্রে তো এর শেষ পাওয়া যায় না। যত বাও ফুরাবে না।

কিন্তু ঐ তো দেখায় ভুঁইমালী বাড়ীর নবরত্ন। তার পাশেই আসর, চকমক করছে রোশনাইতে!

দরবেশ প্রশ্ন করল, 'রাত তো কম হয়নি, এখন আর কত দূর যেতে হবে ?'

গদাই জবাব দিল, 'দূরের জন্য ভাবতাম নি, যদি উজান জল না হতো। এক হাত নাও চলে না পাঁচ টানেও।'

'তা হলে কেমন হবে ? গান কি শুরু হয়েছে ?'

'আর একটু না এগুলে কিচ্ছু ছাই বুঝি নি। এ যেন শেষ নেই—বাইছি তো বাইছিই।' গদাই কিছু সময় কান খাড়া করে বাজনা শুনল। অনুমানে সে যা বুঝল তাই বলল, 'গান আরম্ভ হয়ে গেছে বলেই মনে হয়!'

'তা হলে কি হবে? কেমন করব? ভাই গদাই, আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও। সময় বয়ে গেলে আমি গিয়ে করব কি?'

মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। জলস্থল ঝলকে ওঠে ক্ষণিকের জন্য। দেখা যায় দরবেশের ব্যাকুল মুখখানা। এমনি একদিন আরও দুটি মুখে ব্যাকুলতা ফুটে উঠতে দেখেছিল গদাই। তারা ছিল নারী, আর তফাতের মধ্যে এ হচ্ছে পুরুষ। কিন্তু দৃষ্টি একই রকম অসহায় বলে গদাইর মনে হলো। সেই চারটি চোখ যেন বাসা বেঁধেছে এই দুটি কাতর চোখে।

কাঞ্চনীর কাকচক্ষু বেশি স্পষ্ট হলো গদাইর কাছে। সে শুনল কে যেন গাইছে:

নায়ের নেয়ে পুরুষ কি মেয়ে
একবার মাত্র দেখেছিলাম।···

'কি করব আমি, আর তো দেরি করা উচিত নয়।'

'সেই কথাই ভাবছি দরবেশ—সেই কথাই ভাবছি।' সুপ্তোত্থিতের মত বলে ওঠে গদাই। 'ও কত্তারা ওঠেন, একটু বৈঠা ধরেন—কাম আছে জরুরী, আমরা হেঁটে চললাম!'

উত্তরের অপেক্ষা না করে দরবেশকে নিয়ে গদাই ওপরে ওঠে নাও ভিড়িয়ে।

'একি?' ভোলা প্রশ্ন করে।

'কিচ্ছু লয় কত্তা—শুদ্ধু এই একখানা বাঁক, উজান জালি। ঐ তো ঘাট দেখা যাচ্ছে আপনাদের।'

ষোল

তরতর করে হেঁটে দুজনে অদৃশ্য হয়ে যায় গাছগাছালির অন্ধকারে। গদাই ভোলার রুক্ষকণ্ঠের আর জবাব দেয় না।

সময় বয়ে যায়। এমনি একদিন তার নায়ে ছিল প্রিয় ঠাকুরঝি ও মাছভাজুনী বৌ! এমনি একদিন, সে অনেকদিনের কথা। ওর জীবনের চরম ব্যর্থতা!

খানিক জংলা, খানিক চরো-জমি, খানিক জলা-পার ভেঙে ওরা অন্ধকারেই এগিয়ে চলল। মহব্বতের হাতে হেতেলের লাঠি, গদাইর হাতে একখানা বৈঠা। আলো নেই, কেবল আসর লক্ষ্য করে এগিয়ে চলছে। ঝোপ ঝাড়ের ওপর দু'একটা বাড়ি মারছে গদাই। চওড়া নদীটা যেন ওদের পাশেরই একটা পথ। শেষ নেই, বাঁক নেই, আছে কেবল দীঘলি ছন্দ—কানে আসে শুধু উজানী জলকল্লোল।

মহব্বৎ মন্তব্য করল, 'আজ গান খুব জমেছে—কি বলো?'

'জমার কথা তো ভাই—শেষের পালা এমনি জমে প্রতি বছর। আর গাইছে কে!'

'তুমি গান গাও না?'

'চেষ্টা চরিত্তির কতই তো করলাম, কিন্তু হলো না। বিধাতা সবাইকে কি গুণী করে, না রূপ দেয়?'

'রূপ মানুষের হাতের নয়, তবে যত্ন করলে গুণটা কতক পাওয়া যায়।'

'তাও যায় না, তাও পাওয়া যায় না—পূর্ব্ব জন্মের ভাগ্য থাকা চাই। তোমরা দাদন করে এসেছ, আমি তো কিছু করিনি।'

ওরা কথা বলতে বলতে আসরের কাছে এসে পড়ল। প্রথমে সাজ ঘর, কিছু দূরেই তার আসর। লোকে লোকারণ্য। এখানে

ওখানে আলগা দোকান বসেছে কখানা! পান বিড়ি দিয়াশলাই তাদের পুঁজি। যাদের জমা ভারি তাদের সিগারেটও আছে কয়েক প্যাকেট। চলতি বাজার থেকে দাম অনেক চড়া।

মহব্বৎকে নিয়ে গদাই আসরে ঢোকার আগে, ঢুকল এসে সাজ ঘরে। গদাই এলো আগে আগে পিছনে মহব্বৎ। দরবেশকে দেখিয়ে নেবে ওদের সব চেয়ে গৌরবের গুপ্ত স্থানটা। সকলের এখানে প্রবেশের অনুমতি নেই—অথচ মহব্বতের বেলা তার দরকার হল না মোটেই।

বৃন্দা নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবে—দলের মেয়েরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। এমন সুপুরুষ তারা বড় একটা দেখেনি। পরিচয় যখন দেবে তখন কি যে হবে সে কথা গদাই ভাবতেই পারে না। মুসলিম সন্ন্যাসী। হাতে হেতেলের লাঠি, মাথায় বাবড়ি চুল।

সাজঘরে ঢুকে দেখল গম্ভীর মুখে বসে আছে বৃন্দা। অন্যান্য মেয়েরা চুপি চুপি কি যেন বলা-কওয়া করছে। সাজঘর এমন নিরানন্দ সে কখনও দেখেনি। বিশেষ করে এ সময় বৃন্দা নিয়ম মত একটু নেশা করে এবং মনটা তার থাকে দিল-দরিয়া।

গদাই চুপে চুপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে মালতী দিদি ?'

'গোলকটা পালিয়েছে, অন্নদাকেও দেখা যাচ্ছে না। মধুশীলের পাঠ বলবে কে ? নিমাইর তো সন্ন্যাসের সময় হয়ে এলো।'

এতো রীতিমত বজ্রাঘাত। আগে জানা থাকলে না হয় অন্যপালা ধরা যেত—ভিন্ন ব্যবস্থা করারও একটা উপায় হতো। এখন সর্বনাশ।

আশ্চর্য, বৃন্দা গদাইকে পরম আত্মীয়ের মত কাছে ডেকে বলল, 'এখনও সৌদামিনী আসরে, কিচ্ছু জানে না।···ওটি কে ?'

'একে গায়ক, আবার দরবেশ।'

'বসতে দে ওকে !'

মহব্বৎ বলল, 'না আসরে যাব এখন, বসব না—এসেছি গান শুনতে।'

'এমন দিনেও গান শুনতে এলে। আমার মাথায় বাড়ি দিয়ে শূয়োরটা পালিয়েছে, একটা শূয়োরনীকে নিয়ে।'

গদাই জিজ্ঞাসা করল, 'বিদেয় দিলে কে, টাকা পয়সা না নিয়েই গেল ?'

বৃন্দা কোন জবাব দিল না।

'তুমি তো বড্ড বোকা মেয়ে। দিলে ক্যান? নেশাখোর, গ্যাঁজাখোর কেউ টাকা চাইলে না ভেবে চিন্তে কি দিতে হয় ?'

ইতিমধ্যে মালতীর মনও একটু কর্দ্দমাক্ত করেছিল গোলক। সে কথা তো আর এখানে বলা চলে না! সে জবাব দিল, ও আপদে বিপদে সবাইকে সাহায্য করে—টাকা ও না পায় কার কাছে ? গত বছরের আগের এক বছর আমাকেও দিয়েছে তেইশ টাকা ধার। তা আর শোধ নেয়নি। আজ আমি না বলি কি করে? তবে যদি বুঝতাম এসব অন্নদার চক্কোর তা হলে কি আর দিতাম আমি!'

আসরে একটা ঘণ্টা পড়ল। সকলের মুখ এতটুকু হয়ে গেল—এক্ষুণি মধুশীলকে চাই অর্থাৎ গোলককে।

'এখন কি হবে গদাই?' বৃন্দা বলল, 'আমি আত্মহত্যা করব। আজ পালারও শেষ, আমারও শেষ।' বলে সে শক্ত হয়ে বসে রইল। বিশেষ কোন অসংযম দেখাল না। কিন্তু তার মুখখানা দেখে গদাই মনে মনে ভীত হলো। প্রমাদ গনল মালতী ও অন্যান্য সকলে।

নিমাই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে এসেছে। এখন যাবে সন্ন্যাসে। সে চাঁচর চিকুর আর রাখবে না—শেষ হয়েছে তার বিলাস ব্যসনের অভিলাষ। গৃহস্থের বেশ বাসও সে ত্যাগ করবে। হাত পায়ের নখ কেটে সে পবিত্র হয়ে গঙ্গা জলে স্নান করবে। পার্থিব সমস্ত সুখ দুঃখের সে অতীত হয়ে নদীয়ায় চলেছে—শান্তি চায়, চায় পরম আনন্দ।

নিমাইর ভাব বিগলিত ললিত কণ্ঠ শুনে আসরের সহস্র সহস্র দর্শক মনে মনে যেন অনুভব করল তাদেরও এমনি মুক্তিই কাম্য।

আজ বুঝি সৌদামিনীর ঘুচে গেল যত অন্তরায়।

কিন্তু মধুশীলের যে প্রয়োজন—নইলে কে তাকে অশৌচান্ত করবে নখ এবং চুল কেটে ?

'মধু ও মধু···' ডাকল নিমাই আসর থেকে।

দরবেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। দলের ভাঙনের সব কিছু না বুঝলেও মোটের ওপর সে সারার্থটা ঠিকই ধরতে পেরেছিল। বলল, 'দিদি, আমি মুসলমান, যদি ঘৃণা না করে অনুমতি দাও তবে আসর রাখতে পারি।'

নিস্তব্ধ বৃন্দার যেন চমক ভাঙল।

'তুমি মধুশীলের গান জানবে কি করে ? সে যে বড় কঠিন গান।'

'তুমি ভেব না দিদি, শুধু এই অভাজনকে অনুমতি করো আসরে যেতে। দেখবে অপাংক্তেয়ও কেমন মান রাখতে পারে তোমাদের।' একটা অনির্বচনীয় আলো ফুটে ওঠে দরবেশ মহব্বতের মুখে। 'যাব দিদি ?'

বৃন্দা নীরবে সম্মতি জানাল।

দরবেশ চলে গেল বৃন্দার পায়ের ধুলো নিয়ে। বৃন্দা ভাবল এ আর কেউ নয় কৃষ্ণসখা, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছে মহাভারতের কুরুসভায়,—কলিযুগে উদ্ধার করতে এলো অভিশপ্তা পাতকিনী বৃন্দাকে। সে মনে মনে বলল, 'কেন ছল করে পায় হাত দিলে ছলনাময় ? আমাকে ক্ষমা কর নারায়ণ।'

ব্যাকুল নিমাই গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তার সময় বয়ে যায় সন্ন্যাসের। সে মাথা মুড়িয়ে শুভ্রশুচি হয়ে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেবে, যাবে নদীয়ায়।

মধুশীল গান ধরে আসরে ঢুকল। গেরুয়া রংয়ের আলখাল্লা সে জড়িয়ে বেঁধেছে মাথায়। হাতে ক্ষুর ও কাঁচি—দেখাচ্ছে বড় সুন্দর।

নানা গণ্ডগোলে গানে যেন একটা বিরাম এসেছিল, আবার গমগম করে উঠল আসর।

মধু মধু মধু বলে কে ডাকিল হায়রে…
নামের প্রতি আখরে মধু কেবল ঝরে।…

সোদামিনী একটু থতমত খেয়ে গেল। কে এ? গোলক কোথায়? কেনইবা তার বদলে এ প্রিয়দর্শন যুবক এলো গান গাইতে? কিন্তু গলাখানা তো বেশ। দশ-কুষির স্বর খানা ধরেছে তো পঞ্চমে! যে কারণেই গোলকের বদলি দিতে এসে থাকুক, ওর সঙ্গেই তালে তাল মিলিয়ে সৌদামিনী গেয়ে যাবে গান। শেষে পালা মন্দ হবে না— বেশ একটু নতুনও ঠেকল সৌদামিনীর কাছে।

,আমি ডেকেছি। তুমি আমার মাথা মুড়িয়ে দাও—আমি দীক্ষা নেব গুরুর কাছে।'

'তুমি কে? কেনইবা এমন অল্প বয়সে বিবাগী হয়ে পথে নেমেছ?'

একটুখানি মুখ বিকশিত করল নিমাই।

'আর বলতে হবে না ঠাকুর, আমি তোমায় চিনেছি!' বলে মধুশীল একবার মাত্র চোখ বুঁজল। মনে হল সে যেন তার হৃদয়ের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখল নিমাইর মুখ।

'তবে আর দেরি করো না মধুশীল।'

'না ঠাকুর, দেরি আমি করব না। কিন্তু তোমাকে আমার পিতৃ পুরুষ আজ যে উদ্ধার করে যেতে হবে। আমি পিণ্ড দেব, তুমি একটু দয়া করে মন্ত্র উচ্চারণ কর। ঐ দেখ তৃষিত আত্মারা চেয়ে আছে। তুমি মুক্ত করে দিয়ে যাও।'

'আমি সামান্য ব্রাহ্মণ। আমার এমন কি শক্তি আছে যে তোমার পিতৃপুরুষ উদ্ধার করতে পারি?'

মধুশীল আসরে এক পাক ঘুরে এসে গান ধরল—সামান্য হও যদি, অসামান্য আভা কেন বয়ানে?

'তুমি ভুল বুঝেছ মধুশীল—ভুল বুঝেছ।'

'ভুল যদি বুঝেই থাকি ঠাকুর, এ ভুল যেন আমার ভাঙে না।'

'আচ্ছা তুমি যখন পিতৃপুরুষের ক্ষুধার্ত আত্মার জন্য ব্যাকুল হয়েছ,

তোমাকে আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করব, আগে তুমি আমার কথা রাখ।'

'এগিয়ে এসো ঠাকুর—এসে এই পাথরের ওপর বসো।'

আসর সমেত লোক নির্বাক হয়ে দেখছে, মধুশীল করে কি? কোন্ প্রাণে সে অমন কেশে ধরবে ক্ষুর।

মধুশীল অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিমাইর কৃষ্ণকেশ রাশীর দিকে চেয়ে থেকে বিগলিত কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

এমন কেশে ক্ষুরও দিতে হাতও আমার
নাহি ওঠে গো···
হায় হায় আমি কি কাটিব,
নখ কাটিতে চাঁদ কাটিব?
গৌরের প্রতি নখে নখে চাঁদ গো···
হায়, হায় আমি কি কাটিব?

আসর-ভরা লোক বিহ্বল হয়ে শুনতে লাগল দরবেশের সকরুণ দশকুষি। সকলের প্রাণ হায় হায় করে উঠল নবীন নিমাইর জন্য। আহা চলেছে কিনা সন্ন্যাসে!

মধুশীল চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ক্ষৌরী করে দিতে লাগল সাধুকে। কিন্তু ফুঁপিয়ে উঠল আসর-ভরা ভাবমুগ্ধ জনতা।

নিমাই স্নান করে এল। রূপের সঙ্গে আসরের আলো মিতালী করে অতি অপরূপ করে তুলেছে তাকে। সত্যই তো আর সৌদামিনী কেশরাশ কামাতে পারেনি। মাথায় বেঁধেছে গৈরিক উত্তরীয়। বুকে বাঁধা আছে সেই একই রঙের কাঁচুলি। নারী এখন আর মুগ্ধ করছে না দর্শকদের—পাগল করেছে এক ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী।

নতজানু হয়ে মধুশীল বলল, 'এবার প্রভু কথা রাখ।'

'তুমি এখানে এই নদীর চরে তিল, তুলসী, চিনি এবং কলা কোথায় পাবে? পিণ্ডদান করতে যে এ সকলেরই প্রয়োজন।'

'সে আয়োজন মধুর আছে নারায়ণ—তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।'

মধু একটু বিশ্রাম করে মধুর কণ্ঠে আবার গান ধরল—

মধু তো আমারই নাম
(আর) মধু কোথা পাব ?
বাক্যে যাহা মধু আছে
তাই তোমারে দিব।
মধু বলে নেও হে···

'চিনি কোথায় পাবে ?'

যে চেনাতে তোমায় চিনি,
এনে দেব সেই চিনি···

'তিল ?'

আশি তিলের দেহখানা,
তিল তিল করে দেব হে···

'তুলসী কোথায় পাবে ?'

মধু অমনি সুর ঘুরিয়ে, ভিন্ন তাল মান মাত্রায় গান ধরল—

দ্বিদলের পরে সহস্র দলের আড়ে
একদল পদ্ম আছে, তুলসী আকারে—
দিব সেই তুলসী···

'সবই তো সংগ্রহ হলো মধুশীল, এখন কলা কোথায় পাবে ?'

ষোল কলায় পূর্ণ চাঁদ
ওগো আমার গৌর চাঁদ
অবতীর্ণ হয়েছ ধরায়—
তোমার ষোলকলার
একটি কলা দাও হে···

মধু ভিখারীর মত জোড় হস্তে এগিয়ে এসে অঞ্জলি পেতে রইল। সৌদামিনী ভাবল, এ তো সহজ মানুষ নয়—সাধারণ গাইয়েও নয়! অসাধারণ এর নৈপুণ্য। গোলক সব পারে কিন্তু এমন দীনহীনের মত অঞ্জলি পাততে পারে না। বৈরাগ্যের এ ধাপে নেমে সে কখনও এমন অভিনয় করেনি।

সৌদামিনীর আজ নিজেকে সত্য সত্যই নিমাই বলে ভ্রম হতে লাগল। ভাব এলো আষাঢ়ের মেঘের মত মনের আকাশ ছেয়ে। গেরুয়া সামিয়ানা আরও যেন গাঢ় গৈরিক হয়ে উঠল শেষ রাত্রের আলোতে। 'এইবার তুমি পিণ্ড দাও মধু।'

ধর ধর গৌরহরি

দেহ পিণ্ড দান করি···

সুর করে গাইতে গাইতে মহব্বৎ একেবারে এলিয়ে পড়ল নিমাইর গায়ের ওপর—আজ সে নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিতে চায়। থরথর করে কাঁপছে মুসলিম দরবেশ।

ভক্তবৎসল নিমাই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সাধু, সাধু!'

সভার লোক ধন্য ধন্য করে উঠল। আনন্দে বৃন্দা ও গদাইর বাক্‌রোধ হয়ে এলো। ঘণ্টা পড়ল সেই অঙ্কের।···

সাতের

পালা শেষ হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে সৌদামিনী সবই জানতে পারল। তার আর কোন উৎসাহ রইল না নবাগত দরবেশের পরিচয় জানার জন্য। সে অন্নদাকেও দোষারোপ করল না, গোলকের জন্যও হা-হুতাশ করে দলের সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল না। ভোরের অপেক্ষায় বসে রইল নিজের নায়ে।

গদাই দরবেশের একটা ব্যবস্থা করে, সৌদামিনীর নায়ের গলুইতে এসে কাৎ হয়ে রইল। সারাদিনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের কথা সে গেল ভুলে। তবু মানুষের শরীর তো। মাঝে মাঝে ঝিম আসতে লাগল। ভাল লাগছে চোখ বুঁজে কান খাড়া রাখতে।

ক্রমে পূর্ব দিকটা ফর্সা হয়ে এলো। ভোরের আকাশকে যেন বিছিয়ে দিল গেরুয়া অঞ্চল। সেই রংয়েরই যেন ছোপ লাগল মেঘে মেঘে, ছায়া পড়ল নদীর বুকে। আসরের শূন্য সামিয়ানাটা সারা রাত শিশিরে ভিজে ভারি হয়েছে। ওটা যেন শেষের পালারই নিদর্শন। গত রাত্রে আসর বোঝাই মানুষগুলো কেঁদেছে তো আকুল হয়ে!

'গদাই!'

মহা সহানুভূতিশীল মিত্রের মত জবাব এলো, 'ক্যান ডাকছ, যাই।' একি, এখনও যে তার রাধাদিদি অভিনয়ের বেশভূষা সম্পূর্ণ খোলেনি! না, না, তার ভুল হয়েছে। নিমাইর সাজ তো খুলেছে, পরেছে যোগিনীর বেশ। শুধু কেশপাশ বাঁধেনি। মুছে ফেলেনি ফোঁটা তিলক।

'একটুকুনও চোখ বুঁজলে না? বাকি রাতটা জেগে জেগেই কাটালে?'

'আমি আজ চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় গো?'

'তাতে দরকার কী? তোদের ফুরন ফুরিয়েছে, এখন আমার ছুটি। বৃন্দাদিদিকে বল আমায় বিদায় করে দিতে। তুই আমায় এগিয়ে দিয়ে আসবি জাহাজ ঘাট পর্যন্ত, পারবি নে?'

রাধা কি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল ওদের কাছে? কি সে দলিল? কোন্ সে খত্? কিছুই তো মনে পড়ে না গদাইর। মেয়াদই বা ফুরাল কোন ফুরনের? তবে মিছামিছি ওকে জড়াচ্ছে কেন রাধা? ও নায়ের মাঝি, ভৃত্য সকলের। কোন মহাজনী কারবারেরই তো ও মালিক নয়। ওর স্বত্ব আছে কেবল সেবা করার। তা তো ও প্রাণপণে করেছে। তারই কি পরিণাম এই?

'তুমি দিদি যদি একান্তই যাও, আমার কি, আমি দিয়ে আসবো এগিয়ে। আমার অত গতরের মায়া নেই।' একটু থেমে গদাই আবার সুর বদলে প্রশ্ন করে, 'কিন্তুন যাবে ক্যান?'

'তোদের দল বন্ধ হলো। আমি ফুরন গাইব অন্য দলের সাথে।'

'এ তোমার মিছে কথা—এখন কোন দল আর খোলা নেই ভূ-ভারতে। রাধাদিদি, তুমি কি সত্যিই এত অথের পত্যাশী?'

'তুই কি করে বুঝবি? অথ নইলে কি মিছে নয় সব? শুধু ভুল বুঝে ভুগে মরা?'

এ অর্থের সোজা অর্থ টাই ধরল গদাই। এবং সে অর্থ তো তার যথেষ্টই রয়েছে। কোমরে জালিটায় করকর করছে টাকা। সে জীবন ভরে যা কামিয়েছে, তার একটি কানাকড়িও নষ্ট করেনি। অনুমান করে দেখল, টাকা প্রায় শ' তিনেক হবে। যে দলের সঙ্গে সে চলে তাতে ও ছাড়া কেউ পয়সা জমাতে পারেনি। ওর অন্য নেশা যা-ই থাক, তার সঙ্গে গুরুতার নেশা ছিল সঞ্চয়ের ও কার্পণ্যের। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই গুণটা বেশ ভাল করেই আয়ত্ত করেছিল গদাই। পশু এবং পাখি যে কারণে সন্তান এবং শাবকের যত্ন করে,

হয়ত তেমনি একটা প্রেরণায় ও সঞ্চয় করত অর্থ। এত বছর বসেও কেউ গদাইর কোমরের জালির সন্ধান পায়নি।

ওর সংসার ছিল না, কিন্তু সাধ ছিল অগাধ।

গদাইর একবার ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করে যে সৌদামিনীর কত টাকা চাই? কিন্তু লজ্জায় আচ্ছন্ন করে আনল তাকে। মুখখানা উঠল কুঁচকে।

ভোরের গোধূলি বিফলে গড়িয়ে যেতে লাগল। সৌদামিনী নারী হয়ে যা কামনা করে, ও পুরুষ হয়ে তা পূর্ণ করতে পারে, অথচ বলতে পারছে না কিছুই। ও একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করতে লাগল থলের টাকাগুলো নিয়ে।

পশ্চিম দিগন্তে পাণ্ডুর অস্তগামী চাঁদ আরও পাংশু হয়ে এলো। একটা বলা-না-বলার পরম ক্ষণ বুঝি বা শেষ হয়ে যায়! গদাই আর সৌদামিনীর সাড়া শব্দ না পেয়ে ছইয়ের ভিতর এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে। এত সন্তর্পণে এসব সময় ও চলতে পারে যে অন্যের পক্ষে তা অসাধ্য। ও নিতান্ত অভ্যস্ত বলেই জলের ওপরের নাও কাঁপল না একটুও।

সৌদামিনী চিত্ হয়ে শুয়ে শুয়ে কি যেন ভাবছে। চোখ দুটো তার বোঁজা। জ্যোৎস্নামাখা উষার আলো এসে ঢলে পড়েছে মুখে চোখে।

কি অপূর্ব রূপ!

সন্ন্যাসী নিমাইর ফোঁটা তিলক একটুও এদিক ওদিক হয়নি—শ্লথ হয়েছে শুধু বুকের বসন, কণ্ঠের রুদ্রাক্ষের মালা। যৌবনে যোগিনী সেজেছে শ্রীরাধা। সে কেঁদে কেঁদে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়ছে বুঝি।

কেবল বসনখানি ঘুরিয়ে পরায় কি অপূর্ব পরিবর্তন এসেছে রূপে! সাধু সর্বত্যাগী নিমাই, কৃষ্ণ বিরহিণী শ্রীরাধা হলো পলকে!

এ তো অর্থপিপাসু সৌদামিনী নয়,—গদাইকে এক গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে পাক দিচ্ছে চোখ বুঁজে। না, না ও যে প্রেমময়ী বিরহিণী রাই। পাক দেবে কেন ওকে?

প্রথম যৌবনে কতবার হিংসা ও দ্বেষে ওর অন্তর্লীন প্রেম পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। তারপর ধরেছে গেরুয়া স্রোত। এখন সমস্ত কিছু থিতিয়ে প্রেম হয়েছে মোহমুক্ত নিষ্কাম। যদি গোলককেই ভালবেসে থাকে, তাই বাসুক। ও কৃষ্ণ প্রেমে নিজেকে তিল তিল করে বিলিয়ে দিক। রূপহীন এক যুবক অপরূপ এক যুবতীর পথ আগলে থাকবে না। যে পথে গিয়ে সুখী হও, সেই পথে যাও। আমি তোমায় পার করে দেব বাঁকা নদী, ঝড়ো গাঙ—কিন্তু সঙ্গ নেব না।'

বোকা গদাইর মনে মধুময় কীর্তনের সাধু সংস্রব নিষ্ফল হয় নি। বিলিয়ে দিয়ে সে সকল বিফলতা সাফল্যের স্বর্গদ্বারে নিয়ে যেতে চায়।

তবু অবোধ নয়ন অতৃপ্ত পিপাসায় চেয়ে থাকে। থেকে থেকে লজ্জা আসে, মোহ ভাঙে।

কখন যেন গদাই ফিরে এসে গলুইতে বসে তামাক সাজে।

এক ছিলিম, দু ছিলিম, তিন ছিলিমও পুড়ে যায়।

ঐ তো রাত শেষ হলো, অনেকক্ষণ ধরে দোয়েল ডাকছে পূব সীমানায়।

বহুকাল বাদে আজ আবার গদাই গান ধরে—

পরান বন্দুরে হায় হায় তুমি জাননি
তোমার তরে ঝরে আমার নয়নের পানি···

পাশাপাশি তিনখানা নৌকা। সমস্বরে বিরক্তিসূচক ব্যঙ্গোক্তি ওকে এসে বিদ্ধ করে। 'থাম থাম গদাই, এটা ধোপা বাড়ি নয়।'

গদাইর মনের পরিপূর্ণ ভাব সংগীত হয়ে জন্মাতে পারে কি পারে না, এর মধ্যেই তা সমাধি লাভ করে।

ও চুপ করে বসে থাকে। খালের জলে ভোরের রাঙা আলো এসে মিশে মিশে ঘুলিয়ে চলে। একটা যেন কি পাখি অনেক দূর থেকে ডেকে উঠল কী খেদে! কতদূরের চর থেকে শব্দ এলো বোঝা গেল না। তবু প্রাণে বাজল, বুক যেন চিরে গেল আজকার এই প্রভাতের।

একটু বেলা হলে গদাই বলল, 'বিন্দেদিদি শুনছ নি, রাধাদিদি বিদেয় চায়।'

আজ তো যাবেই সকলে, কিন্তু সৌদামিনী যে আবার বৃন্দাকে ছেড়ে যাবে তা কখনও ভাবেনি সে। ফুরন যে গায় সে অল্পদিনের জন্যই আসে এবং সময়ের মেয়াদ অতীত হলে তখনি চলে যায়। তবু সৌদামিনীর যাওয়াটা অভাবনীয়। বৃন্দা কি বলবে, কি ওজর আপত্তি তুলবে চিন্তা করে পেল না। তার মনটা কেন জানি কেবলই নরম হয়ে উঠতে লাগল। এই সৌদামিনীকে ও-ই ঘর থেকে বের করেছে, ও-ই ছিন্ন করেছে ওর গার্হস্থ্য জীবন—অথচ আজ যেন ওকেই দিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে একটা পরম নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা।

'না গেলেই কি নয় বোন? এখনও তো কর্তারা কিছু টাকা পয়সা দেয়নি। দেবে খাওয়া-দাওয়ার পর।'

'তবে থাক, আমি দেরি করতে পারব না।'

কেন, এ কথাটা জিজ্ঞাসা করার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু এমন যে বৃন্দা সেও এ প্রশ্ন করতে পারল না। ব্যাপারটা জানে সকলে। এর কাছে নিষ্ফল কোনও প্রশ্ন বা আবেদন নিবেদন।

'এত পাগলও হয় মানুষে।'

'বিন্দেদিদি, আসলে রাধাদিদি আমাদের মত মানুষ নয়। তুমি ঠাহর পাওনি এতকাল ধরে?'

সৌদামিনী গিয়ে গদাইর নায়ে উঠল। দল সমেত সকলে ম্লান মুখে চেয়ে রইল। এবার বৃন্দার কেবলই মনে হতে লাগল এই যাওয়াই বুঝি ওর শেষ যাওয়া। বৃন্দা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে নায়ের ভিতর চলে গেল। মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল যেন একটা আঘাত বারবার এসে লাগছে ওরে বুকের পাঁজরে। বৃন্দা স্বীকার করে সৌদামিনীর সঙ্গে ওর শুধু ছিল স্বার্থেরই সম্পর্ক—কিন্তু ঐ পোড়া স্বার্থই যত অনর্থের মূল। জন্মেছে একটা মমতার মহীরুহ কেমন করে যেন সকলের অজ্ঞাতে। কে যেন টাংগি চালাল শিকড় লক্ষ্য করে।

বর্ষার আবহাওয়া। একটা মেঘ করে এলো প্রভাতী আকাশে। কালো ছায়া তার থমথম করতে লাগল নদী জল ও বাতাসে। একটা দমকা হাওয়ায় শিরশির করে উঠল পারের গাছপালা। কতকগুলো শুকনো পাতা উড়ে পড়ল জলে।

বৃন্দা ছইয়ের ভিতর ঢুকে তার বাক্স পেটারা খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। সৌদামিনীকে দেওয়ার মত তো তার কোন সঞ্চয়ই নেই। ওকে বিদায় দিতে হবে খালি হাতেই!

আজ বৃন্দার মন মথিত করে কেবলই গুটি কয়েক প্রশ্ন জাগল—এতদিন ধরে ও করল কি? কি জমল এত গানের বায়না গেয়ে? এমন করে চুষে নিংড়ে নিয়ে সমাজ, দর্শক, এই যে এত আপ্যায়ন কি দিল তাকে? ও আর মুখ বের করল না ছইয়ের বাইরে।

গদাই কেন দলের সকলেই ভাবল বৃন্দা চামারেরও বাড়া। এমন শূন্য হাতে কারুকে কেউ বিদায় দেয়? একবার কূলে গিয়ে কিছু চেয়ে আনলেই হতো।

কিন্তু সে শক্তি এবং লিপ্সা তখন আর বৃন্দার ছিল না। বৃন্দা ঠায় গালে হাত দিয়ে বসে রইল।

গদাই নাও খুলে দিল। অমনি বাদলা নামল আকাশের পাঁজর ভেঙে। 'রাধাদিদি, এখনও ভেবে দেখ যাবে কি যাবে না? আমার কি, মাঝি মাল্লার কাছে রোদ্দুর জল সমান।'

রাধা বলল, 'গদাই তোর কষ্ট হলেও একটু সাহায্য কর—আর তো বলব না, আমার দেরি করার মত সময় নেই। তুই আবার বেঁকে বসিসনে।'

গদাই জলে ভিজে ভিজে বৈঠা মারতে লাগল আর কেমন করে যেন হেসে হেসে বলতে লাগল, 'উল্টা বুঝলে এতদিন পরে? ছিঃ ছিঃ মাঝি মাল্লার একটা আবার কষ্ট হয় নাকি? ছিঃ ছিঃ মাঝি মাল্লার··· ছিঃ ছিঃ কষ্ট হয় নাকি?"

আঠার

বেলা শেষ হয়ে এলো। জল থেমেছে অনেকক্ষণ।

'আর কতদূর গদাই ?'

'ঐ তো উজানীর বাঁক, তারপর কনকতলার গোটা দুই ঘোপ— তারপর ইষ্টিসান।'

'তোর ঐ তো বাপু আর তো শেষ হয় না, রাত হবে নাকি ?'

'হতে.পারে। ভয় কি তোমার গদাই থাকতে নায়ে।'

'ভয় নয়, ভাবনা হচ্ছে জাহাজ পাই কিনা! অন্নদার বাড়ি একবার মাত্তর গিয়েছিলাম, সেই ওর বোনের বিয়েতে। সেকি একটু আধটু পথ!'

'তুমি আবার ফিরবে কবে ?'

'জানি নে।'

'আর এ দলে গাইবে নি, আসছে আয়ামে (গানের মরশুমে) ?'

'বলব কি করে ?'

'তবে কি আর দেখা হবার নয় ?'

'ক্যান হবে না ? তুই থাকবি ঘাটে ঘাটে, আমি থাকব গঞ্জে গঞ্জে।'

একটু ঘুম পেল সৌদামিনীর। ক্লান্ত চোখের পাতা বুঁজে এলো নদীর হাওয়ায়। ধীরে ধীরে বেলা পড়ে গেল। সন্ধ্যা নেমে এলো যেমন নেমে আসে প্রত্যহ। গদাই নাও বেয়ে চলেছে কখনও উজানে কখনও গোনে (অনুকূল স্রোতে)।

'একেবারে খালি হাতে চললে—একটা দিন আর তর সইল নি !'

কোন জবাবই দিল না রাধা।

'জীবন ভরে সবই তুচ্ছ করলে ?'

সন্ধ্যার আঁধারে কথাগুলি খুবই সারগর্ভ শোনাল।

'বাড়ি ঘর বন্ধু বান্ধব ছেড়ে এলে, একবারও সে কথা মুখে আনলে না, ছাড়লে এতগুলো পাওনা টাকা তার জন্যিও মায়া নেই—তোমার বুকখান কি পাষাণ দিয়ে গড়া? তুমি আবার আমার সাথে দেখা করবে, বিশ্বেস করে কে?'

নৌকা আরও খানিকটা এগিয়ে এলো। গদাই ভাবল সৌদামিনী শুনছে চুপ করে। সে বলে যেতে লাগল, 'এত তুচ্ছ করে জীবনে তো সুখ পেলে না! তোমার জন্য দুঃখ হয়—পরান পোড়ে রাধাদিদি।'

কিন্তু গদাইও তো সুখী নয়। সে তো কারুকে সারা জীবনে সজ্ঞানে অবজ্ঞা বা অবহেলা করেনি। তবে তার জীবন এতখানি অভিশপ্ত কেন? সুখ কি নেই?

অন্ধকার, বেদনা ও নৈশ আবহাওয়ায় মূর্খ গদাই যেন দার্শনিক হয়ে উঠল। তার মনে এসে এ জগতের শত সহস্র দুঃখের উদাহরণের মধ্যে যাদের সে একান্ত করে পরিচয় পেয়েছে তাদের ব্যথাতুর মুখ কটি ভেসে উঠল।

ঠাকুরঝি ঠাকুরাণী যেন সেই গানখানা গাইল—আর একবার যেতে অনুরোধ করল সেই বেশ্যা মেয়েটি, যে প্রগলভার মত ওকে একা পেয়ে খেয়েছিল চুমো। এত অভাব তবু টাকাটি নিল না। এর হেতু আজও বুঝে উঠতে পারল না গদাই।

মেয়েরা কি তুচ্ছ করে সবই? তারপর সারা জীবন ভরে গান গায়? নিজের ভুলের গান? গদাই খেই হারিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে অনেক চিন্তাই করল, যার যুক্তি নেই, যোগ নেই—না আছে কোনও অর্থ। তবু তা ব্যর্থ হয় না। সময় কাটে, এগিয়ে চলে নাও।

এরপর দিন কাটবে, মাস কাটবে, বছর কাটবে গদাইয়ের খেইহারা চিন্তায়—সুখ কি নেই, ওর মত কুরূপ কুৎসিতের কাছে সুখ কি শুধু কল্পনা?

আজ আর জ্যোৎস্না নেই। সুদূরপ্রসারী নদী, তটরেখা, ওপারের বালুচর কিছুই দেখা যাচ্ছে না—সকলি অস্পষ্ট, শুধু স্পষ্ট অন্ধকার। কিন্তু ঝিকিমিকি তারা আছে। ওরা যেন আশা—আসবে না শুধু বসে বসে ডাকবে।

এই নিরালা আঁধার নদীপথে একা যাত্রী সৌদামিনী। গাঙে আর দ্বিতীয় কোন নাও নেই।

'এ কোথায় এলি গদাই, এত দেরি লাগছে ক্যান ?'

'যাচ্ছি একদিকে···'

'কোথায় ?'

'না যদি বলি।'

'এ কেমন কথা !' ছই থেকে বেরিয়ে এলো সৌদামিনী।

'তুমি ভেবনি, ভাবনা কি, আমি রয়েছি গলুইতে।'

সৌদামিনী ছই থেকে বের হয়ে যা দেখল তাতে সে কিছুই চিনতে পারল না। মনে হচ্ছে নাও যেন ভিন্ন পথে চলেছে। সত্যই তো কোথায়ও ষ্টেশনের চিহ্ন নেই। কেবল কালিলেপা জমাট অন্ধকার। সে ভয় ও সন্দেহে অধীর হয়ে উঠল। 'একি গদাই ?'

'এই তো গোকুলে চলেছ—অকূলে।'

নিদারুণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থাকে সৌদামিনী। এ সব কি কথা !

নিস্তব্ধ নদীর বুক হঠাৎ সচকিত করে হেসে ওঠে গদাই—হাঃ হাঃ হাঃ। কদর্য মুখে প্রেতের হাসি বলে মনে হয়। 'এই উজানে কেমন করে নাও ফিরাই নাগরী ?'

'তুই কি আমার সঙ্গে হ্যাকামি জুড়ে দিয়েছিস মুখপোড়া ? একি নৌকাবিলাস কাব্যি ? ফেরা শীগগির নাও।'

গদাইর মুখ সত্যই পোড়ে নি, কিন্তু অন্তর দগ্ধ হয়ে যেতে লাগল। এই কি শ্রীরাধার আসল রূপ ? সে তো শুধু একটু ঠাট্টা করেছে। ঝরণার মত হাসতে জানে না, একটা অস্বাভাবিক হাসি হেসেছে।

'রাধাদিদি বাঁক ফিরল নাও, ঐ তো ইষ্টিসান—ঐ তো লাল নীল আলো। মিছামিছিই বকলে!'

'গা লাগিয়ে বৈঠা মার!'

সৌদামিনী ভিতরে চলে গেল। বাইরে শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে গদাইর কোমরের টাকাগুলি কেমন যেন করুণ স্বরে কনকন করছে বৈঠা মারার চোটে।

কিন্তু গদাই সে শব্দ লক্ষ্য করছে না। সে প্রাণপণে বেয়ে চলেছে নৌকা।

কিছুদূর এগিয়ে তেরছা হয়ে গাঙ পাড়ি দিল গদাই। মুখখানা তার নিচু। কি ভাব, কি গ্লানি, কি মর্মস্পর্শী ব্যথা যে সে মুখে রেখায়িত হয়েছে তা সৌদামিনী চেয়ে দেখল না। কূলে নৌকা ভিড়তেই সে একটা বোঁচকা হাতে করে ওপরে উঠল।

যেখানে নাও ভিড়েছে সেখানটা বন্দরের একটা নির্জন স্থান। একটু জ'লো চর ভেঙে হেঁটে গেলে জাহাজ ঘাটের সিঁড়ি ঠেকবে পায়।

পাতলা একটু মেঘ ভেসে এসেছে। এখন আর ঝিকিমিকি আলো নেই। আশার দীপ কটি যেন ঢাকা পড়ে গেছে আষাঢ়ের আঁধারে। বাদলা নামাও আশ্চর্য নয়। গাঙের জল বুঝি ছলছল করে উঠছে ওপারের আবর্তে।

সুন্দরী সৌদামিনী চলল, কুৎসিত অপাংক্তেয় গদাই চেয়ে রইল।···

একটু পরে গদাই ছুটে এসে কি যেন সৌদামিনীর হাতে দিল। 'পথে ঘাটে বিপদ আপদ আছে তো!'

'একি! না, না—শোন গদাই শোন···একি দিলি···'

গদাইর সারা জীবনের সঞ্চয়ের নিক্কণ বেজে উঠল সৌদামিনীর হাতে।

গদাই ততক্ষণে ফিরে এসেছে নায়ে। সে বিদ্যুৎবেগে বৈঠায় ঠেলা দিল।

মাঝ গাঙে যাওয়ার আগেই জল নামল। গান শোনা গেল ভিজা গলার—ভিজা সুরের। আজ যে সংগীত জন্মাল তা সৌদামিনী লক্ষ্য করল ভাব এবং তালের অপূর্ব সমন্বয়ে ভরপুর। অনেকবার অনেক গান গেয়েছে গদাই, কিন্তু তা এমন সার্থক হয়ে ওঠেনি কখনও—

ওগো পরাণ বন্দুরে
একব্যার দিয়া
বলো তো ক্যামনে
নিব ফিরাইয়া,
আহা, আমি পারব নি,
আমি পারব নি···
